দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন

মোহাম্মদ জুলকারনাইন

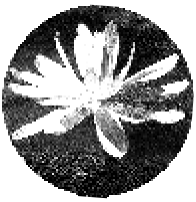

দুজন বাদশাহ্
যাঁরা নবী ছিলেন

দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন

মোঃ জুলকারনাইন

হাকিমাবাদ
খানকায়ে
মোজাদ্দেদিয়া

দুজন বাদশাহ্
যাঁরা নবী ছিলেন

মোঃ জুলকারনাইন

প্রচ্ছদ
অবদুর রৌউফ সরকার

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং
তৃতীয় প্রকাশ

প্রকাশক
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ
যোগাযোগ ০১৭২৬২৮৮২৮০, ০১১৯০৭৪৭৪০৭

মুদ্রক
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল,ঢাকা-১০০০
মোবাইল ০১৭১১-২৬৪৮৮৭
০১৭১৫-৩০২৭৩১

বিনিময়
মাত্র পঞ্চাশ টাকা

DUJON BADSHAH JARA NOBEE CHHILEN: The life of two honourable prophet Hazrat Daud (As) and Hazrat Sulaiman (As) written by Mohammad Zulkarnine and Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia, Bhuighar, Narayangonj. Printed by Shawkat Printers, 190/B Fakirapool, Dhaka-1000, Cover Designer Abdur Rouf Sarker

---

Exchange Tk. 50/- U.S.$ 10.00

ISBN 984-70240-0043-9

بسم الله الرحمن الرحيم

মানুষের হেদায়েতের অছিলা মানুষ। যাঁরা মানুষের হেদায়েতপ্রাপ্তির মাধ্যম তাঁরাই নবী এবং রসূল। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর এই সমস্ত প্রিয় বান্দাগণের মাধ্যমে বিশ্বমানবতাকে সত্যের প্রতি পথপ্রদর্শন করেছেন। আর এই ধারায় সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা স. কে দিয়ে। তিনিই শেষ ও শ্রেষ্ঠ রসূল। তিনি যে শেষ নবী– কাদিয়ানী সম্প্রদায় একথা মানে না। তাই তারা মুসলমান নয়। যদিও তারা নামাজ পড়ে এবং কোরআন তেলাওয়াত করে। এই সম্প্রদায়কে উৎখাত করার চেষ্টা ইমানী দায়িত্ব।

হজরত রসূলে পাক স. এরশাদ করেছেন– 'আমার সাহাবা সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করো– তাদের দোষচর্চা করো না।' ....আবুল আলা মওদুদী একথা মানে না। সে সাহাবা কেরাম রা.গণের দোষচর্চা করে 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' নামে অপবিত্র বইখানি লিখেছে। আর যেহেতু হাদিস শরীফে এসেছে– সাহাবায়ে কেরামের দোষচর্চাকারীরা অভিশপ্ত। তাই নিশ্চয় মওদুদী অভিশপ্ত। তার অনুসারীরাও অভিশপ্ত। যদিও তারা নামাজ রোজা করে এবং কোরআন পড়ে। কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে উৎখাত করা যেমন ইমানী দায়িত্ব, তেমনি মওদুদী সম্প্রদায়কে উৎখাত করাও ইমানী কর্তব্য। আল্লাহ্পাক কাদিয়ানী ও মওদুদী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করুন। আমিন।

মানুষের হেদায়েতের অছিলা মানুষ। সুতরাং প্রকৃত অর্থে যাঁরা মানুষ (কামেল ইনসান) তাঁদের নিকট নিজেকে সমর্পণ (বায়াত) না করলে হেদায়েতপ্রাপ্তি সম্ভব নয়। এখন নবী রসূল নেই। কিন্তু তাঁদের প্রতিনিধিগণ (কামেল মোকাম্মেল পীর মোর্শেদ) আছেন। তাঁদের প্রতিনিধিত্বের শৃঙ্খল পীরানে কেরাম পরম্পরায় হজরত রসূলে পাক স. পর্যন্ত যুক্ত আছে। তাঁদের মাধ্যমে হেদায়েতের শৃঙ্খলের সঙ্গে শৃঙ্খলিত না হলে বিভ্রান্তি অনিবার্য। যারা এই শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয় তারা শয়তান ও প্রবৃত্তির শৃঙ্খলে বন্দী। আমরা তাই প্রবৃত্তি বন্দী মানবতাকে হেদায়েতের শৃঙ্খলে সংযুক্ত হবার আহ্বান জানাই।

যাঁদের মাধ্যমে বন্দী মানবতা পেয়েছে মুক্তির স্বাদ, সেই সমস্ত আল্লাহ্তায়ালার প্রিয় বান্দা-নবী রসূল, সাহাবা, আউলিয়াদের জ্যোতির্ময় জীবনের কাহিনী প্রচার করি আমরা। এই পবিত্র প্রচেষ্টার প্রেক্ষাপটে এবার আমরা মেলে ধরেছি– **'দুজন বাদশাহ যাঁরা নবী ছিলেন'**। এটি আমাদের আটাশতম প্রকাশনাসম্ভার। আল্লাহ্পাক কবুল করুন। আমিন।

নিশ্চয় আমাদের জীবন মৃত্যু সকল সৎকর্মরাজি বিশ্বসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্তায়ালার জন্যই। উৎকৃষ্টতম দরূদ ও সালামসমূহ বর্ষিত হোক রসূলে আকবর মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা স. এর প্রতি। তৎসহ অন্যান্য নবী ও রসূলগণের প্রতি এবং সমস্ত সাহাবা ও আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি।

আল্লাহুম্মা আমিন।

সালাম। শুরুতেও। শেষেও।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

Awg Zv‡`i Dfq‡KB
m² wePviÑkw³ I cÁv
`vb K‡iwQ jvg|

miv Avw¤qv

এক

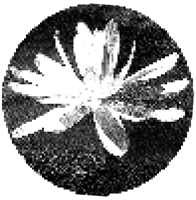

অধিকাংশ বনিইসরাইল বাদশাহ্ তালুতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলো। পানি তাদেরকে এমনই প্রলুব্ধ করলো যে, সতর্কবাণী সহজেই হলো উপেক্ষিত। অল্পসংখ্যক সৈনিক বাদে সবাই পেট পুরে পানি পান করলো। বাকী রইলো যারা তাদের মধ্যে কেউ কেউ সামান্য এক আঁজলা পরিমাণ পান করলো। অবশিষ্টরা চরম ধৈর্যের পরিচয় দিলো।

সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখালো তারা। এসব সংযমী ব্যক্তিরা নদীর নিকটবর্তীও হলো না। বাদশাহ্ তালুতের অনুগত হয়ে দূরে সরে রইলো।

পেট ভরে পানি পানকারীদের একপ্রকার অবসাদ দেখা দিলো। চরম ক্লান্তি এসে গ্রাস করলো আপাদমস্তক। চলৎশক্তিরহিত হয়ে পড়লো তারা। হাত পা ছড়িয়ে সবাই বসে পড়লো নদীর পাড়ে। অপর পাড়ে যাওয়ার সাধ্য আর নেই তাদের।

বাদশাহ্ তালুত কী করবেন এখন। সাবধান তো তিনি করেই দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা না শুনলে কি করবেন। বিষণ্ন মনে বাকী লোকলস্কর নিয়ে তিনি আবার যাত্রা শুরু করলেন।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মোমিনদেরকে নিয়ে তালুত নদীর বিপরীত তীরে পৌঁছলেন। এখানেও স্বস্তি নেই। নদী পাড়ি দিয়েই দলের ভিতর দুর্বলতা দেখা দিলো। এ দুর্বলতা দেহে নয়, দেখা দিলো মনে। এক আঁজলা পানি পানকারীরা শংকিত হয়ে উঠলো। ভয়ার্ত ভাব ফুটে উঠলো তাদের চোখে মুখে। নিজেদের সংখ্যাল্পতার ভীতি তাদের প্রবল হলো।

'আমাদের সংখ্যা কমে যাওয়াতে শক্তিধর জালুত ও তার সৈন্যদলের মুখোমুখী হওয়ার শক্তি আমাদের হবে না।' এই বলে আশংকা প্রকাশ করলো দুর্বলচিত্ত লোকগুলো।

–আল্লাহ্তায়ালার আদেশে ছোট দল বড় দলের উপর বিজয়ী হয়েছে। এ রকম দৃষ্টান্ত তো একটি নয়, দুটি নয়, অনেক। প্রতিপালকের সাহায্য কেবল ধৈর্যশীলদের সঙ্গে। জবাব দিলেন স্থিরচিত্ত লোকেরা– যারা পিপাসার্ত হওয়া সত্ত্বেও নির্বিকার ছিলেন।

ইমানের দৃঢ়তা থাকলেই এরকম কথা বলা যায়। যারা দুর্বলতার শিকার তারা শুধু উপকরণের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। লোকসংখ্যা, অস্ত্রসম্ভার ইত্যাদি তুলনামূলক বিশ্লেষণে লেগে যায়। অন্তর রোগগ্রস্ত বলে আল্লাহ্তায়ালার প্রতিশ্রুতির উপর তারা পুরোপুরি নির্ভর করতে পারে না।

মাত্র তিনশতো তেরজন যোদ্ধা নিয়ে বাদশাহ্ তালুত রণাঙ্গণে উপস্থিত হলেন। এদের মধ্যে হজরত দাউদ আ.ও রয়েছেন। কিছুসংখ্যক সবল সৈনিকদের তিনি অন্যতম। তখনো হজরত দাউদ আ. নবী নন। তাই তেমন প্রসিদ্ধও নন।

দু'পক্ষ সামনাসামনি হলো একসময়। ক্ষুদ্র দলটির তুলনায় রাজা জালুতের দলটি বিশাল। দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর জুড়ে আমালেকা বাহিনীর মাথাই শুধু নজরে আসে। আমালেকাদের আনন্দ আর ধরে না। প্রতিপক্ষের ছোট্ট সমাবেশ তাদের হাস্যরসের খোরাক যোগায়। তার উপর রাজা জালুত স্বয়ং আজ সৈন্য পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। কাজেই এ যুদ্ধের ফলাফল কী হবে তা নিয়ে তাদের মনে কোনো দ্বিধা নেই। নিশ্চিত বিজয় সামনে উপস্থিত।

রাজা জালুত জীবন্ত কিংবদন্তী। মানুষের মুখে মুখে তার বীরত্বগাঁথা শোনা যায়। এমন মহাযোদ্ধার উপস্থিতি আমালেকাদের মনোবল কেবলই চাঙ্গা করে তোলে। সে কি গর্জন জালুতের। যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসেই চিৎকার করে সে ত্রাসের সঞ্চার করলো। বিপক্ষের লোকবল দেখে তার আস্ফালন বেড়ে যায় কয়েকগুণ।

দুই

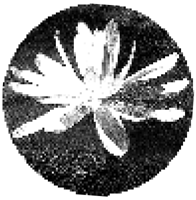

দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহবান জানায় জালুত। হেঁকে ডেকে তুলকালাম অবস্থা। তবুও বনিইসরাইলদের কেউ এগিয়ে আসে না তার দিকে।

বাদশাহ্ তালুতের দলের সবাই কমবেশী জালুতের শক্তিমত্তা সম্পর্কে জানেন। তার ভয়ানক চেহারা দেখে আর বিশ্রী গর্জন শুনে কেউ এককভাবে তাকে মোকাবেলার চেষ্টা করলেন না। ভাবছেন সকলে কীভাবে অত্যাচারী জালুতের লাফঝাঁপের সমুচিত শিক্ষা দেয়া যায়।

তাদের ভাবনার কোনো সুরাহা না হতেই হজরত দাউদ আ. এগিয়ে গেলেন। এগিয়ে গেলেন অসমসাহসে ভর করে জালুতের কাছাকাছি।

হজরত দাউদ আ. এর সুদৃঢ় পদক্ষেপ নির্ভীক যোদ্ধার অন্তরে কাঁপন ধরায়। তাঁকে দেখে বিস্ময়ে হা হয়ে যায় আমালেকারাজ।

এ আবার কোন্ যোদ্ধা! কাঁচা বয়সী দেখা যায়। কিন্তু হাঁটাচলায় তো অনভিজ্ঞ বলে মনে হচ্ছে না। বেশ অভিজ্ঞ বলে ধারণা হয়। যাকগে। ভাবে জালুত। ত্রাস সৃষ্টি করা যার কাজ তার পক্ষে এসব ভাবালুতা শোভা পায় না। কী করবে এ তরুণ তার মত পরাক্রমশালী শত্রুর বিরুদ্ধে।

বিস্ময়ের বদলে কৌতুক এসে ভর করে জালুতের কুমন্ত্রণাপ্রাপ্ত অন্তরে। আবার সে গর্জে উঠলো। হুংকার ছেড়ে হজরত দাউদ আ.কে নিরস্ত করার চেষ্টা করলো। কিন্তু সফল হলো না। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য হম্বি তম্বি কোনো কিছুই ফেরাতে পারে না হজরত দাউদ আ.কে তাঁর কর্তব্যবোধ থেকে। জাতির এমন ঘোর দুর্দিনে তিনি কি করে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। তাঁর মতো দেশপ্রেমিকের পক্ষে এ যে অবাস্তব। এগিয়ে যান তিনি জালুতের দিকে নির্ভয়ে।

কাছে পৌছেঁই হঠাৎ পাথর ছুড়ে মারলেন হজরত দাউদ আ.। অব্যর্থ লক্ষ্য জালুতকে আঘাত হানলো। মাথা ঘুরে উঠলো তার। একি! গুলিয়ে যাচ্ছে কেনো সবকিছু। নাহ! দেহটাকেও আর নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না। আছড়ে পড়লো

জালুতের বিশাল ধড় মাটিতে। একটি মাত্র পাথরের ঘায়ে জালুতের মতো নামীদামী বীর ধরাশায়ী হলো। প্রায় সাথে সাথেই প্রাণবায়ু নির্গত হলো তার।

ভয় আর বিস্ময়ের সংমিশ্রণ আমালেকা সম্প্রদায়কে স্থবির করে ফেললো। এটা কি করে সম্ভব হলো! ওহ্ এযে স্বপ্নের অতীত। এমন ঘটনা চোখে দেখেও কি বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু......

ভীতসন্ত্রস্ত জালুত বাহিনী পালানোর কথা ভুলে গেলো। এ সুযোগে বাদশাহ্ তালুতের দল ভীষণবেগে তাদের উপর আঘাত হানলো। ইমানের বলে বলীয়ান সৈনিকদের কাছে হতোদ্দম আমালেকারা চরমভাবে মার খেতে লাগলো। নেতার অকাল মৃত্যুতে সাহস যোগানোর তাদের আর কেউ রইলো না। প্রতি আক্রমণ তো দূরের কথা, গা বাঁচানোই তাদের পক্ষে সুকঠিন হয়ে দাঁড়ালো। দিশেহারা সৈন্যরা অবশেষে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো।

বহুকাঙ্খিত বিজয় এখন বনিইসরাইলদের করায়ত্বে। গোটা সম্প্রদায় আজ আনন্দে উল্লাসমুখর। উল্লসিত জনতা যেনো আজ পাগলপারা। কি দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলোই না বনিইসরাইলদের উপর দিয়ে বয়ে গেলো। বিজয়ী সেনাদলের সাথে সাথে সাধারণ নাগরিকরা একাত্ম হয়ে খুশীর জোয়ারে মেতে উঠলো। নতুন করে বাঁচার আশায় উজ্জীবিত হলো সবাই। মুষ্টিমেয় তালুতবাহিনীর সাফল্য তাদের জীবনবোধই পাল্টে দিয়েছে।

এবার চিনলো সবাই হজরত দাউদ আ. কে। যাঁর একমাত্র আঘাতে জালুতের মতো বলশালী যোদ্ধাকে ইহলীলা সাঙ্গ করতে হয়েছে– তাঁকে কে না চিনবে। অতি অল্প সময়ে দিকে দিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। একটি ঘটনা দ্বারাই ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করলেন, হজরত দাউদ আ.। আল্লাহ্পাক যাঁকে চান তাঁকে যে কোনোভাবেই সুখ্যাতি দান করেন। আল্লাহ্তায়ালার প্রিয় তো তিনি ছিলেনই। এখন জনপ্রিয়তা পেলেন।

হজরত শিমবীল আ. এর দুনিয়া থেকে পর্দা করার সময় এসে গেলো। তিনি জরুরী বাণী রাখলেন জাতির উদ্দেশ্যে। ভালমতো বুঝিয়ে দিলেন তাদের কতব্যকর্ম। তারপর বনিইসরাইলদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন তিনি। বিদায় নিলেন নশ্বর ভূলোক থেকে। হজরত শিমবীল আ. নবুয়তের উত্তরসূরী রেখে গেলেন হজরত দাউদ আ.কে।

হজরত দাউদ আ. মানুষের সর্বোচ্চ সম্মান 'নবুয়ত' লাভ করলেন। সেই সাথে পেলেন বাদশাহী। বাদশাহ্ তালুতেরও স্থলাভিষিক্ত হলে তিনি। এখন তিনি একাধারে নবী এবং বাদশাহ্।

তিন

ফিলিস্তিন। বহু স্মৃতিবিজড়িত ফিলিস্তিন।

বনিইসরাইলদের স্বপ্নের দেশ। এ পিতৃভূমি হারিয়ে দীর্ঘকাল তারা ছিলো উদভ্রান্ত।

হজরত মুসা আ. এর ইন্তেকালের পর হজরত ইউশা আ. নবী মনোনীত হন। তাঁর নেতৃত্বে বনিইসরাইল ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়।

এরপর আর তাদেরকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। শুধু সামনে চলা আর চলা। নিরাপদ রাজ্যের দিকে দিকে তারা বসতি স্থাপন করতে থাকে। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো বনিইসরাইলরা বিস্তীর্ণ এলাকায়।

দিন দিন গড়ে ওঠে নতুন জনপদ। ধীরে ধীরে শুরু হলো সেখানে ব্যবসার প্রসার। ক্ষুদ্র জনপদগুলো থেকে বাণিজ্য চলে দেদার। এক এলাকার পণ্য আরেক এলাকায় সরবরাহ বেশ লাভজনক হয়ে দেখা দিলো। তাছাড়া এ জাতির আদি পেশা পশুপালন তো রয়েছে। এ কাজেও অচিরেই তারা অবস্থাপন্ন হয়ে উঠলো।

বনিইসরাইলদের সুবর্ণ যুগে হজরত ইউশা আ. বিদায় নিলেন জাগতিক কর্মকাণ্ড থেকে। এরপর হজরত কালব আ. বনিইসরাইলদেরকে পরিচালনার প্রত্যাদেশ পেলেন। তিনি তাঁর সময়কালের পুরোটাই জতির জন্যে ব্যয় করলেন। পর্যাপ্ত অবদান রাখলেন মানুষ গড়ার কাজে।

ভালো হোক মন্দ হোক সকল মানুষ তথা জীবকেই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করতে হয়। নবীরাও বেঁচে থাকেন না চিরকাল। তাঁদেরকেও চলে যেতে হয়।

হজরত কালব আ.ও থাকলেন না বেশীদিন। তিনিও তাঁর পূর্বসূরীর অনুসরণ করলেন মৃত্যু দুয়ার পেরিয়ে। তাঁর স্থান নিলেন হজরত হিযক্বীল আ.। তারপর ক্রমান্বয়ে হজরত ইলয়াস আ, হজরত ইয়াসা আ. প্রমুখ নবীগণ বনিইসরাইলদের পথ-পরিচিতি প্রদানের কাজ অব্যাহত রাখেন।

পার হয় মাস। বছর। শতাব্দী। শতাব্দীর পর শতাব্দী। ইতিবাচক শতকগুলো হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। বহুকালের নিদ্রিত সরীসৃপ জেগে উঠলো যেনো। বিগত দিনগুলো সুখস্বপ্নে রূপ নিতে চললো। ছন্দপতন ঘটলো বনিইসরাইলদের সুখভোগে।

ইতোমধ্যে পুনরুত্থান ঘটেছে দুর্ধর্ষ আমালেকা জাতির। ফিলিস্তিন ও মিশরের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে এদের অধিবাস। দীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করে তারা জেগে উঠেছে। এখন জালুত-ভয়ংকর জালুত তাদের রাজা। তার দিক নির্দেশে আমালেকারা হয়ে উঠলো অপ্রতিরোধ্য। রাজা জালুতের পতাকাতলে সমবেত হয়ে তারা বনিইসরাইলদের আক্রমণের পরিকল্পনা আটলো। সিদ্ধান্ত নেয় জালুত। বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো ফিলিস্তিনে চড়াও হতে হবে। কোনোরকম প্রতিরোধের সুযোগ দেয়া যাবে না বনিইসরাইলদেরকে।

প্রবলভাবে আক্রান্ত হলো ফিলিস্তিন। আমালেকা সম্প্রদায়ের ঝটিকা আক্রমণে খড়কুটার মতো ভেসে গেলো বনিইসরাইলি প্রতিরোধ। কোনো প্রচেষ্টাই তাদের টিকলো না শেষাবধি। নিহতদের লাশে আর আহতদের কাতরধ্বনিতে বায়ুস্তর আলোড়িত হলো। আতংকের কালো ডানা বিস্তারিত হলো ফিলিস্তিন জুড়ে।

হতাহতের পাশে বসে ক্রন্দনরতা রমণীরা সিংহহৃদয় যোদ্ধাদেরকেও কাঁদিয়ে ছাড়লো।

এ আক্রমণে বনিইসরাইলরা ভীষণভাবে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হলো। ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা দুষ্কর। গোটা জাতি সন্ত্রস্ত হলো আরেকটি কারণে। ব্যাপক লুণ্ঠনের এক পর্যায়ে আমালেকারা তাদের পবিত্র আমানত তাবুতে সকিনা বা শান্তির সিন্দুক নিয়ে চলে যায়। এর ভিতর তওরাত শরীফের মূল পাণ্ডুলিপি, হজরত মুসা আ. এর ব্যবহৃত লাঠি এবং হজরত মুসা ও হজরত হারুন আ. এর জামা সুরক্ষিত ছিলো।

জানমালের ক্ষয়ক্ষতি যতটা তাদেরকে বিচলিত করলো, তার চেয়ে বেশী বিব্রত করলো পবিত্র বস্তু লুণ্ঠনের সংবাদ। এতে বনিইসরাইলদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। কোত্থেকে যে কি হয়ে গেলো। চরম সর্বনাশের আর বাকী রইলো কী? শত শত বছরের গচ্ছিত সম্পদ এই তাবুতে সকিনা– তাও হাত ছাড়া হয়ে গেলো। এমন অত্যাচার কাঁহাতক সহ্য করা যায়। কিন্তু উপায়ই বা কোথায়? রাজা জালুত ও তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এমন বীর কোথায়?

জাতির ক্রান্তিকালে আবির্ভূত হলেন হজরত শিমবীল আ.। এমন সময় নবী হলেন তিনি। হাল ধরলেন দিগভ্রান্ত সম্প্রদায় বনিইসলাইলের।

স্বস্তি ফিরে এলো কিছুটা ফিলিস্তিনে। অন্ধকার আবর্তে প্রদীপ্ত শিখা দেখতে পেলো বনিইসরাইল। তাদের মৃতপ্রায় অন্তর নতুন করে বাঁচার আশায় সঞ্জীবিত হলো। যাই হোক– একটা উপায় এবার হবে। ভাবে তারা। একজন নবীর পথনির্দেশই তাদেরকে এই দুঃখের চোরাবালি থেকে উদ্ধারের পথ দেখাতে পারে।

চার

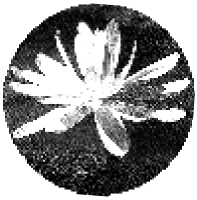

নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে উপস্থিত হলো বনিইসরাইলরা হজরত শিমবীল আ. এর কাছে। আবেদন জানালো দুর্গতি মোচনের ব্যবস্থা বাতলে দেয়ার জন্যে। সেই সাথে একজন নেতা মনোনীত করে দেয়ার কথাও নবীকে জানাতে ভুললো না তারা। যাতে অত্যাচারী রাজা জালুতের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হয়। এমন দূরাচারের বিপক্ষে সংঘবদ্ধ হয়ে না দাঁড়ালে কীভাবে জয়ী হওয়া যাবে?

নবী আশ্বস্ত করলেন সবাইকে। তারপর সুমার্জিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'এরকম আশংকা নেই তো যে, তোমাদের নেতা মনোনীত করার পর যখন জেহাদ তোমাদের উপর ফরজ হবে– তখন তোমরা জেহাদে এগিয়ে যাবে না।'

নবীর আশংকা অমূলক নয়। তিনি তো বনিইসরাইলদের স্বভাব সম্পর্কে ভালো করেই জানেন। বহু অতীত কার্যকলাপ তাদের সাক্ষ্য বহন করে। হজরত মুসা আ. এর সঙ্গে কী আচরণ করেছিলো তারা তাতো অজানা থাকার কথা নয় কারো।

'আমাদের পক্ষে জেহাদ না করার কী কারণ থাকতে পারে? শত্রুদের দ্বারা যেখানে আমরা সন্তান-সন্তুতি ও বাড়ীঘর হারিয়েছি।' বনিইসরাইলরা নবীর কথায় প্রতিবাদ করে উঠে।

এবার হজরত শিমবীল আ. তাদের জন্যে মনোনীত নেতার কথা ব্যক্ত করেন। 'স্বয়ং আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন তালুতকে বাদশাহ্‌ ও নেতা রূপে।'

এভাবে বনিইসরাইলদের উপর জেহাদ ফরজ হলো। কিছুসংখ্যক লোক ছাড়া অবশিষ্টরা জেহাদ বিমুখ হয়ে রইলো। নবীর সহজ কথা তাদের হজম করতে বেগ পেতে হলো। প্রতর্কে মুখর হলো ইসরাইলি জনতা। চিরাচরিত স্বভাব তাদেরকে নবীর কথা মেনে নিতে বাধা দিলো।

'তালুত কীভাবে আমাদের নেতা হতে পারে।' বললো তারা। 'আমরা তাঁর তুলনায় অধিক উপযুক্ত। তাঁর তো আর্থিক স্বচ্ছলতাও নেই।'

হজরত শিমবীল আ. অন্তর্বেদনা অনুভব করলেন তার সম্প্রদায়ের কথা শুনে। কষ্টানুভূতি বেড়ে যায় তাঁর। কেমন জাতি এরা। এরা কি কোনোদিনই স্থিরমস্তিষ্ক হবে না।

‘তালুতকে আল্লাহ্পাক তোমাদের উপর বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। মনোনীত করেছেন। আর তাঁকে দৈহিক গঠনে, শক্তিতে তোমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।’ মনের কষ্ট চাপা রেখে কথাগুলো বললেন নবী। ‘আল্লাহ্পাক যাকে খুশী রাজত্ব দান করেন।’

আরো বললেন তিনি, ‘তালুতের বাদশাহ্ ও নেতা হওয়ার বাহ্যিক নিদর্শন এই যে, তোমাদের প্রতিপালকের বিশেষ কুদরতে তাবুতে সকিনা বা শান্তির সিন্দুক তোমাদের কাছে প্রত্যার্পিত হবে। যাতে রয়েছে হজরত মুসা ও হজরত হারুন আ. এর পরিত্যক্ত বস্তু।’

অচিরেই নিদর্শন প্রকাশিত হলো।

কথিত আছে, শত্রুরা তাবুতে সকিনা যে স্থানেই রাখে সেখানেই মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। দিন দিন আমালেকাদের ভীতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। সিন্দুকটি নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। লুণ্ঠিত সিন্দুক নিয়ে কী বিপত্তিই না হলো। মহা ফ্যাসাদ। এটা কোথায় রাখা যায়– এ ভাবনা তাদেরকে কুরে কুরে খেতে থাকে রাত দিন। কেউ কাছে যেতে চায় না। আবার এটা কোথাও রাখা যায় না। কী মুশকিল।

অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলো শত্রুপক্ষ– সিন্দুকটি চাকা ইত্যাদি জুড়ে গরুর পিঠে চাপিয়ে ছেড়ে দেয়া যাক। উন্মুক্ত মরুভূমিতে যে দিকে খুশী এটা চলে যাক। তাই করলো জালুতের দল। কৌশলে গরুর পিঠে সিন্দুক তুলে দিয়ে সেটাকে মরুভূমির দিকে তাড়িয়ে দিলো। তখন ফেরেশতারা গরু হাঁকিয়ে সিন্দুকটি বনিইসরাইলদের কাছে এনে দিলেন।

বনিইসরাইলদের জল্পনা কল্পনার অবসান হলো। নিদর্শন দেখে তাদের মন তরল হয়ে এলো। আপত্তি করলো না তারা বাদশাহ্ তালুতের নেতৃত্ব মেনে নিতে।

বাদশাহ্ তালুতের তত্ত্বাবধানে অভিযানের প্রারম্ভিক প্রস্তুতি শুরু হলো। বিপুল পরিমাণ লোকের যোগদানে তালুতের বাহিনী জনসমুদ্রে পরিণত হয়ে গেলো। তারপর বীরবিক্রমে এগিয়ে চললো এ বাহিনী রণক্ষেত্রের দিকে।

বনিইসরাইলরা ক্রমশ সম্মুখপানে এগুতে লাগলো। কতো মেঠো পথ– চড়াই উৎরাই পাড়ি দিচ্ছে তারা তার কোনো হিসেব নেই। চোখে তাদের জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন। ধিকি ধিকি জ্বলছে স্বজন হারানোর বেদনা তাদেরকে যেনো উন্মত্ত করে তুলছে।

'আল্লাহ্‌পাক তোমাদেরকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করবেন।' পথিমধ্যে বাদশাহ্‌ তালুত বললেন তাঁর দলকে, 'শত পিপাসা পেলেও পেট পুরে পানি পান করা নিষেধ। কাজেই যে কেউ সে নদীর পানি পান করবে সে আমার সাথী হবে না। আর যে পানি মুখেও তুলবে না সে আমার সহযাত্রী হবে। অবশ্য যে শুধু এক আঁজলা পান করবে সেও আমার সঙ্গী হবে।'

সূর্যের প্রখর তাপে ঝলসে যাচ্ছে মরু অঞ্চল। সেই সাথে বিক্ষিপ্ত লু হাওয়া গরম বৃদ্ধিতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ভূপৃষ্ঠের মধ্যে মরুভ্রমণ বড়ই ক্লেশকর। এদিক সেদিক তাকালেই চোখ ঝিকিয়ে ওঠে।

ভ্রমণক্লান্ত তালুতবাহিনী তৃষ্ণা বোধ করলো। রসদ যা ছিলো তাতো পথেই সাবাড়। তেষ্টায় একেক জনের ছাতি ফাটার যোগাড় হলো। এমন সময় তাদের দৃষ্টিসীমায় একটি নদী দেখা গেলো। এক সময় নদীর কাছে পৌঁছে গেলো বনিইসরাইলরা।

টলটলে স্বচ্ছ পানি। আহা! কতোদিন নদীর দেখা নেই। নেই ইচ্ছে মতো পানি পানের সুযোগ। এইতো চোখের সামনে পানি। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়।

পাঁচ

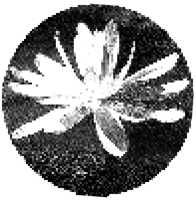

ফিলিস্তিনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো।

হজরত দাউদ আ. এর সুদক্ষ রাষ্ট্র পরিচালনা এখানকার অধিবাসীদেরকে নিশ্চিত জীবনযাত্রার আস্বাদ এনে দিলো। সুখী সমৃদ্ধ রাজ্য বলতে যা বুঝায় ফিলিস্তিন হলো তাই।

নবীর সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা সমাজের সর্বস্তরে ন্যায়ের দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করলো। আর তা হবে না-ই বা কেনো। নবুয়তের বিশেষ জ্ঞান দ্বারা যিনি শাসন কার্য সমাধা করবেন তাঁর কাজ তো সাধারণ রাজ-রাজাদের জন্যে অনুকরণীয় হতেই হবে।

হজরত দাউদ আ. একটি নির্দিষ্ট সময় নিয়ে রাজদরবারে বসেন। প্রজা তথা উম্মতের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ শোনেন। সেসব শুনে তিনি অবস্থানুযায়ী মীমাংসা করে থাকেন। প্রজাসাধারণের জন্যে তাঁর দ্বার সে সময় উন্মুক্ত থাকে। যে

কেউ কোনো দরকার হলে দরবারে আসতে চাইলে কোনোরূপ বাধার সম্মুখীন না হয়েই এখানে আসতে পারেন।

এক মাহেন্দ্র ক্ষণে হজরত দাউদ আ. এর কাছে আসমানী গ্রন্থ যবুর অবতীর্ণ হলো। আসমানী গ্রন্থ বিশিষ্ট নবীগণ লাভ করেন। হজরত মুসা আ. এর পর তিনি এ মর্যাদার অধিকারী হলেন।

হজরত দাউদ আ. এর কণ্ঠস্বর এতো সুস্পষ্ট আর এতো সুললিত যে তা এককথায় অদ্বিতীয়। যখন তিনি পরিমার্জিত কণ্ঠে যবুর পাঠ শুরু করেন তখন এক অপ্রাকৃত দৃশ্যের অবতারণা হয়। স্বচক্ষে না দেখলে তা অনুমান করা কঠিন। তাঁর পরিশীলিত কণ্ঠের মোহময় তেলাওয়াত শুরু হলে তা শোনার জন্যে গভীর অরণ্য থেকে, আশপাশের গাছপালা থেকে পাখিরা ছুটে আসে। তন্ময় হয়ে পক্ষীকুল তাঁর তেলাওয়াত শ্রবণ করতে থাকে। ভুলে যায় পাখিরা তাদের অস্তিত্ব। দৈনন্দিন কর্মপরিধি।

নবী যখন তসবিহ পাঠ করেন তখনো পাখিরা দল বেঁধে তাঁর কাছে চলে আসে। তাঁর তসবিহ পাঠে প্রভাবান্বিত হয়ে তারাও মগ্ন হয়ে যায় তসবিহ পাঠে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো পাখিরা বিচিত্র শব্দে তসবিহ পাঠ করে অনেকক্ষণ ধরে। এরকম সকাল বিকাল ঝাঁক বেঁধে নবীর সাথে আল্লাহ্‌তায়ালার স্মরণে লিপ্ত থাকে। দর্শক শ্রোতা যারা উপস্থিত হয় বিমোহিত হওয়া ছাড়া তাদের উপায় থাকে না। এমন দৃশ্যপট কে কবে দেখেছে যে নির্লিপ্ত থাকবে।

এমনকি স্থবির পাহাড়গুলোও হজরত দাউদ আ. এর জিকির শুনে স্থির থাকতে পারে না। তারাও হজরত দাউদ আ. এর সাথে প্রভু প্রতিপালকের স্মরণে লিপ্ত হয়। প্রভুস্মরণের অদ্ভুত শ্রুতিমধুর শব্দ তাদের গা থেকে স্পষ্ট শোনা যায়।

যবুর পাঠ হজরত দাউদ আ. এর জন্যে সহজ করে দেয়া হয়েছে। তাঁর উপর অবতারিত গ্রন্থ যবুর যা সাধারণত দীর্ঘ সময় লেগে যায় পাঠ শেষ করতে। তা তিনি অতি অল্প সময়ে সমাপ্ত করতে পারেন। এও তাঁর আরেক মোজেজা। কখনো তিনি তাঁর লোককে নিজ বাহনের উপর জিন ও আসন বাঁধার আদেশ দিয়ে তেলাওয়াত আরম্ভ করেন। লোকটি জিন বেঁধে ফেলার আগেই তিনি তেলাওয়াত নিষ্পন্ন করেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত দাউদ আ.কে হস্তশিল্পেও বিশেষ দক্ষতা দান করেছেন। হরেক প্রকারের হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরীতে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। সারা জগত খুঁজলেও তাঁর নিকটবর্তী পারদর্শী কাউকে পাওয়া যাবে না।

তাছাড়া একাজের সহায়ক আরেকটি অনন্য মোজেজা আল্লাহ্‌পাক নবীকে দান করেছেন। কোনো রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ বা কোনো উপকরণ ছাড়াই তাঁর পবিত্র হাতের সুকোমল স্পর্শে কঠিন লোহা নরম হয়ে যায়। নমনীয় মোমের মতো লোহা

দিয়ে তিনি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরী করেন। যুদ্ধের পোশাক, বর্ম– এসবও তৈরী করেন। এমন সব সামগ্রী তিনি প্রস্তুত করেন যা দেখে সমকালীন শিল্পবোদ্ধারা তাক লেগে যান।

বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েও হজরত দাউদ আ. ধনাঢ্য নন। রাজকোষ থেকে তিনি কখনোই কিছু অর্থ বা ভাতা গ্রহণ করেন না। অঢেল ঐশ্বর্য শুধু উম্মতের প্রয়োজনেই ব্যয় করেন। নিজ হাতে তৈরী সামগ্রী বিক্রি করে সে অর্থে নিজের এবং পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করেন।

রাজকার্য, নবুয়তের কাজের আঞ্জাম, জীবিকা সংস্থানে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকার পরেও বাকী সময়ের সিংহভাগ নবী ইবাদত বন্দেগীতে অতিবাহিত করে থাকেন। ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর একটি সুন্দর নিয়ম রয়েছে। স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে অধিক ইবাদত করার জন্যে হজরত দাউদ আ. এর আদর্শ সর্বকালের জন্যে অনুসরণীয়। তিনি রাতের প্রথমার্ধে নিদ্রিত থাকেন। তারপর উঠে নামাজে মশগুল হয়ে পড়েন। আবার সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত বিশ্রাম নেন। এ নিয়ম আল্লাহ্‌পাকের কাছে খুবই পছন্দনীয়।

হজরত দাউদ আ. এর রোজা রাখার নিয়মতো হজরত রসুলে পাক স. এর অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছে। শরীর সুস্থ রেখে দীর্ঘকাল রোজা রাখার জন্যে সত্যিই এ পদ্ধতির জুড়ি নেই। হজরত দাউদ আ. একদিন রোজা রাখেন আর একদিন রোজাবিহীন কাটান। এভাবেই তিনি সারা বছর রোজা করেন।

ছয়

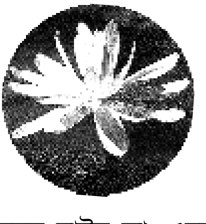

হজরত দাউদ আ. এমনভাবে নিজের পরিবারের সবার জন্যে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন– যেনো কোনো প্রহর বাদ না পড়ে। এক মুহূর্তও আল্লাহ্‌পাকের ইবাদত ছাড়া অতিবাহিত না হয়। এভাবে ইবাদত বন্দেগীতে তাঁর পরিবারের লোকজন অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন। তাঁরা নবীর আদেশকৃত সময়গুলোতে একাগ্র সাধনা চালিয়ে যান দিনের পর দিন।

তাছাড়া হজরত দাউদ আ. এর একটি চার দিনের রুটিন রয়েছে। এ চার দিনের একদিন নবী জনমানবহীন ভবনে কাটান। এদিন তাঁর সঙ্গে কারো দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা থাকে না। বাড়ীর দোর গোড়ায় পাহারা বসান। যাতে কেউ তাঁর একনিষ্ঠতায় বাধ সাধতে না পারে।

আর একদিন নবী মামলা মোকদ্দমার রায় প্রদান করেন। দরবারে আগত অনেক প্রজার অভিযোগ শ্রবণ করেন। এদিনটি তিনি কেবল মামলার জন্যেই খালি রেখেছেন।

তৃতীয় দিন বাদশাহ্ দাউদ আ. রেখেছেন পারিবারিক কাজকর্ম দেখা শোনা করার জন্যে। শত ব্যস্ততার মাঝেও নবী তাঁর পরিবারকে সময়টি দেন। কারণ, ঘরের লোকদেরও তো তাঁর উপর দাবী রয়েছে। আর সেটা তিনি যথার্থভাবেই পালন করেন।

চতুর্থ দিন নবী আরেক রূপে সাধারণ্যে দেখা দেন। এদিনটি তিনি ওয়াজ নসীহতে ব্যয় করেন। কীভাবে মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হবে তার চেষ্টা ফিকির করেন। আর এদিন তিনি তার সাহাবীদেরকে নিয়ে শরীয়তের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচানয় নিমগ্ন থাকেন। বর্ণনা করেন বহু মাসআলা মাসায়েল। যবুর কিতাবের মর্ম অনুধাবনেও সঙ্গীদেরকে তিনি উৎসাহিত করেন।

নবীর প্রত্যক্ষ শিক্ষা ছাড়া আসমানী গ্রন্থ আত্মস্থ করবে কে? যিনি শরীয়তের বাহক, প্রদাতা তিনিই তো শিক্ষা দেবেন প্রথমে মানুষকে। আর আত্মিক লক্ষ্যের মাধ্যমে মানব অন্তর প্রশস্ত করবেন। তবেই না সাহাবীদের মাধ্যমে শরীয়তের বাস্তব রূপায়ন ঘটবে সাধারণের মাঝে।

হজরত দাউদ আ. এর এ পদ্ধতি চলতে থাকে ক্রমাগত। আবর্তিত হয় মাসের পর মাস।

একদিন নবী বললেন, ‘হে পরওয়ারদেগার! দিন রাতের প্রতি মুহূর্তে দাউদ পরিবারের কেউ না কেউ অবশ্যই আপনার ইবাদতে মশগুল থাকে।’

আল্লাহ্তায়ালা বললেন, ‘এসব কিছু একমাত্র আমার সাহায্যেই হয়ে থাকে। আমার সহায়তা না পেলে তুমি কোনো কিছুতেই সক্ষম হতে পারো না। আমি তোমাকে একদিন নিজের উপর ছেড়ে দেব।’

আজ সেই দিন। হজরত দাউদ আ. এর ইবাদতের নির্দিষ্ট দিন।

এদিন তিনি বিশেষ সতর্কতার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করলেন। নিভৃত আবাসের ফটকে রয়েছে শ্রেষ্ঠ প্রহরী। ঈগল পাখির চোখ নিয়ে সে পাহারা দিচ্ছে নবীর নিরালা ভবন। কোনো প্রাণীর আগমনই তার দৃষ্টি এড়ানোর জো নেই।

কিন্তু আজ যে পরীক্ষার দিন। আজকে তো আল্লাহ্তায়ালা নবীর মাধ্যমে বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষা দেবেন। আজ সহস্র সতর্ক দৃষ্টিও তো কোনো কাজে আসার কথা নয়। কাজেই হজরত দাউদ আ. এর পাহারাদারের শ্যেন চাহনি কাংখিত ফল প্রদানে ব্যর্থ হলো। পরীক্ষা এলো তার অলক্ষ্যে।

হঠাৎ দুইদল লোক নবীর নির্জনাবাসের পিছনের দেয়াল টপকে ভিতরে ঢুকে পড়লো। ঢুকলো তারা নিঃশব্দ পদক্ষেপে। ফলে বাড়ীর সামনের দিকে অবস্থানরত প্রহরী তাদের উপস্থিতি টের পেলো না।

লোকগুলো এরপর হজরত দাউদ আ. এর কক্ষে প্রবেশ করলো। ঘটনার আকস্মিকতায় ধ্যানমগ্ন নবী চমকে উঠলেন। আচমকা এতোগুলো লোকের উপস্থিতি। কি ব্যাপার! কি হয়েছে আজ। কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়লেন নবী। তাঁর ইবাদত যে বিঘ্নিত হয়েছে সেকথা বলা বাহুল্য।

'আমরা দু'টি বিরোধী পক্ষ। একে অপরের বিচারপ্রার্থী। আপনি আমাদের দু'দলের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দিন। আমাদেরকে সহজ পথ বাতলে দিন।' বিবাদমান দু'দল নবীকে আস্বস্ত করে বললো।

একজন তাদের মধ্য থেকে বললো, 'আমার এক ভাই নিরানব্বইটি দুম্বার মালিক। আর একটি মাত্র দুম্বা আমার অধিকারে আছে। তা সত্ত্বেও সে আমাকে বলে আমার পশুটি তাকে দিয়ে দিতে। এ নিয়ে সে তর্কে যুক্তিতে আমার উপর প্রবল। আমি তার সঙ্গে পেরে উঠি না।'

অভিযোগ বিবেচনা করে হজরত দাউদ আ. বললেন, 'এ ব্যক্তির এতোগুলো প্রাণী থাকার পরেও তোমার দুম্বাটি চাওয়া নেহাতই অন্যায়। একত্রে বসবাসকারীরা অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর এরকম অন্যায় অবিচার করে থাকে।' তিনি আরো বলেন, 'যারা খাঁটি মোমিন ও সৎকর্মপ্রবণ হন তারা সতর্ক থাকেন, অন্যায় আচরণের নিকটবর্তী হন না। অবশ্য এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুব কম।'

চকিতে নবী বুঝে ফেললেন লোকগুলোর আগমনের কারণ। এ তো আর কিছু নয়। এটা নিশ্চয় আল্লাহ্পাকের পরীক্ষা। তা না হলে এতোগুলো মানুষ দেয়াল টপকে সামান্য ব্যাপারে এখানে কেনই বা আসবে। আসলেই আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য ছাড়া একপলকও নিরাপদ থাকা সম্ভব নয়। নিবিষ্ট মনে ইবাদত করাও সহজ নয়। লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহ্ ছাড়া কোনো সহায়তা নেই। তিনি ছাড়া কোনো শক্তি নেই।

প্রায় সাথে সাথেই হজরত দাউদ আ. সেজদাবনত হলেন। এভাবে তিনি মহানপ্রভুর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হলেন। নবীর কাতর প্রার্থনায় করুণার সাগর উদ্বেলিত হলো। অনুকম্পা পেলেন তিনি। আরো পেলেন উঁচুস্তরের মর্যাদা।

এসব ঘটনা নবীর মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়। এটা বুঝতে কোনো স্বচ্ছ মনোবৃত্তির অধিকারী ব্যক্তিরই বেগ পেতে হয় না। পূতিগন্ধময় অন্তরের অধিকারী ব্যক্তিরাই শিক্ষণীয় ঘটনার অপব্যাখ্যা করে থাকে।

সাত

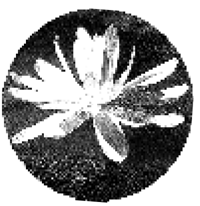

শনিবার দিনটি হজরত দাউদ আ. এর সম্প্রদায়ের জন্যে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন। পবিত্র এদিনটি কেবলমাত্র ইবাদত বন্দেগীর জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। শরীয়তের নিরীখে এদিন পার্থিব কাজকর্ম নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়।

নবীর উম্মতেরা শনিবার দিনটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। সকাল হতে না হতেই তারা সাংসারিক ঝামেলা গুটিয়ে ইবাদতে মনসংযোগ করেন। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করেন।

এভাবে চললো কিছুদিন। কিন্তু হজরত দাউদ আ. এর প্রজাদের একাংশ শনিবার দিনটি নিয়ে অচিরেই এক মহাসমস্যায় পড়ে গেলো। এরা হলো রাজ্যের সমুদ্র উপকূলে বসবাসকারী জেলে সম্প্রদায়। মাছ শিকার করাই এদের একমাত্র পেশা। সাগর তীরবর্তী এলাকায় এটাই লাভজনক জীবিকা। তাছাড়া এখানে অন্য কোনো ব্যবসা বাণিজ্য সহজলভ্য নয়।

জেলেরা প্রতিদিন মহাদেশীয় সোপান থেকে মাছ আহরণ করে নিকটস্থ বাজারে নিয়ে যায়। তারপর সেগুলো বিক্রি করে অর্থকড়ি নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। অথচ শনিবার দিন তারা একাজ করতে পারে না। শরীয়তের নিষেধাজ্ঞা থাকার জন্যে এ দিন তাদেরকে মৎস্য শিকার বাদ দিতে হয়। এতে জেলেরা অত্যন্ত অসুবিধা অনুভব করলো। শরীয়তের আইন তাদের মোটেও পছন্দ হলো না। ভালো না লাগার প্রধান কারণ হচ্ছে– এদিনটিতে অন্যান্য দিনের তুলনায় মাছের আগমন বেশী দেখা যায়। এমনকি সামুদ্রিক প্রাণীগুলো জেলেদের হাতের নাগালে চলে আসে।

পর্যাপ্ত মাছ হাতের কাছে। কিন্তু ধরা যাবে না। এটা কোনো কথা হলো। ক্রমবর্ধমান লোভ ধীবর সম্প্রদায়কে পাগলপারা করে তুললো। কি করা যায়। কি করা যায়। কীভাবে আইন ফাঁকি দেয়া যায়। এ নিয়ে অস্থির হয়ে পড়লো জেলেরা। বড্ড ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।

উপায় একটা বেরিয়ে পড়লো। শয়তান তো এটাই চায়। মানুষের প্রকাশ্য শত্রু শয়তান। লোভী অন্তরে কুমন্ত্রণা ঢেলে দিতে তার কতোক্ষণই বা লাগে।

শরীয়ত লংঘনের অপকৌশল উদ্ভাবন করে ফেললো জেলেরা। এরপর সে অনুযায়ী কাজ শুরু করলো। তরিৎ গতিতে উপকূল এলাকায় পুকুর খনন করলো

তারা। তারপর খাল কেটে সমুদ্রের সাথে সেটার সংযোগ ঘটালো— যাতে করে সাগরের পানি খাল বেয়ে তাদের সদ্যকাটা পুকুরে চলে আসতে পারে।

পরের শনিবার খাল বেয়ে পানির সাথে সাথে প্রচুর মাছ ভেসে আসতে লাগলো পুকুরের দিকে। আনন্দ আর ধরে না মৎস্যজীবী লোকদের। কী সুন্দর ব্যবস্থা।

মাছে পুকুর ভরে গেলো কিছুক্ষণেই। সাথে সাথে জেলেরা খালের সাথে পুকুরের সংযোগ বন্ধ করে দিলো। ফলে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ জলাশয়ে আটকা পড়ে গেলো।

হয়েছে এবার। বেশ হয়েছে। ভাবে জেলেরা। কাল এসে তুলে নিলেই হবে। শিকার তো আর শনিবারে করলাম না আমরা। রোববারেই সেটা করবো। আমাদের মাছ ধরাও হবে আবার শরীয়তের বাহ্যিক কাঠামোও ঠিক থাকবে। এতে অসুবিধার কী আছে। আমরা নেহাত চালাক বলে এরকম একটা বন্দোবস্ত করতে পেরেছি।

কিন্তু দুর্ভাগার দল বুঝলো না। একবার চিন্তা করেও দেখলো না যে, মাছ ধরার মূল কাজ শনিবারেই সম্পন্ন হয়েছে। রোববারের কথা বলাতো প্রহসন মাত্র। বস্তুতঃপক্ষে লোভ মানুষের সহজাত শুভবুদ্ধি নষ্ট করে দেয়। প্রবৃত্তির প্রাবল্য মানবদৃষ্টিকে অন্ধ করে ফেলে। মন্দ প্রবৃত্তির দাসত্ব যারা করে তারা জ্ঞানীদের মতো কথাবার্তা বললেও প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকে ফাঁকি দেয়। এর পরিণাম তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে।

মাছ ধরা নিয়ে জেলেদের মধ্যে দেখা দিলো বিপত্তি। এতে তাদের মাঝে তিনটি দল সৃষ্টি হলো। একদল মৎস্য আহরণের অপকৌশল অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন করে। শুধু তাই নয়। তারা এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণও করে। কোনো মূল্যেই তারা এ অবৈধ কাজ পরিত্যাগ করতে রাজী নয়।

দ্বিতীয় দল তাদের এ কাজের তীব্র বিরোধীতা করলো। বোঝাতে চাইলো তাদেরকে, এটা করা কোনো মতেই ঠিক নয়। বিভিন্ন বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে এ দলটি জেলেদের নিবৃত্ত করতে সচেষ্ট রইলো। কিন্তু কে শোনে কার কথা। না শোনার ভান করে অপকর্মের হোতারা তাদের অকাজ চালিয়েই যায়।

তৃতীয় দলটি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করলো। সম্পূর্ণ নিশ্চুপ রইলো তারা এ ব্যাপারে। নিজেরা অপকর্মে লিপ্তও নয়। আবার কাউকে বাধা দান করতেও সচেষ্ট নয়।

ধীবর সম্প্রদায়ের প্রথম দলটি ভাবতেও পারেনি যে, তাদের জঘন্য মনোবৃত্তির ফলাফল এতো শিগ্‌গির চলে আসবে। আসলে কোনো প্রতিফল আসবে বলে তাদের মনেই হয়নি।

আচমকা আজাব এসে পড়লো তাদের উপর। পবিত্র দিন উপেক্ষাকারী জেলেরা বানরে পরিণত হলো। জ্ঞান, বুদ্ধি, অনুভূতি সবকিছু বর্তমান রইলো। শুধু আকৃতি বদলে গেলো তাদের। আর বাকশক্তি হলো রুদ্ধ। কী পরিতাপের বিষয়।

অথচ এখন করার কিছুই নেই। সময়মতো উপদেশ শ্রবণ না করে কী দুর্গতিই না তাদের হলো। অতীত কর্ম স্মরণ করে একে অপরকে দেখে অশ্রু বিসর্জন করা ব্যতীত তাদের আর করার কিছুই রইলো না।

অব্যক্ত যন্ত্রণা আজাব প্রাপ্ত বানরদের চোখ বেয়ে পানির আদলে ঝরে পড়ে। লাঞ্ছিত জীবন তাদেরকে এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতেই নরক যাতনার বিস্বাদ গ্রহণে বাধ্য করলো। বেশীদিন তাদেরকে পার্থিব জিল্লতি ভোগ করতে হয়নি। মাত্র তিন দিন তাদের এ অবস্থা বলবৎ রইলো। তিন দিন পর বানররূপী জেলেরা মারা গেলো একে একে সবাই।

আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেরিত আজাবে তৃতীয় দলটিও ধ্বংস হলো। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যায় কাজে বাধা দান না করার কারণে তারা নিশ্চিহ্ন হলো। শুধু অসৎকাজ থেকে বেঁচে থাকাই যথেষ্ট নয়। এতে বাধা দেয়াও আজাব মুক্ত থাকার শর্ত। এজন্যে যারা নিজেরা দুষ্কর্ম করেনি– যারা করেছে তাদেরকেও বাধা দিয়েছে– তারা আজাব থেকে পরিত্রাণ পেলো। মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে তারাই কেবল স্বআকৃতিতে টিকে রইলো।

আট

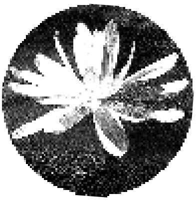

যথাসময়ে নবজাতক আগমন করলেন। উজ্জ্বল নক্ষত্র যেনো বাদশাহ্ দাউদ আ. এর ঘরে নেমে এলো। একি মানব নাকি অন্য কিছু। নাকি ভুল করে কোনো বেহেশতি ব্যক্তিত্ব এখানে– এই মাটির ধরায় পদার্পণ করেছেন। অপরূপ। এমন সুন্দর চেহারাও কোনো মানব শিশুর হয়। যে একবার দেখে তারই দুচোখ শীতল হয়ে যায়।

শাহী মহলের বাইরে উন্মুক্ত আকাশ, মরুভূমি, পাহাড়, বিশাল বনরাজি নিশ্চুপ বসে নেই। সমুদ্রের নীল অতলান্ত জলরাশি পর্যন্ত আজ নবী পরিবারের আনন্দে ভাগ বসিয়েছে। স্মরণের নিজস্ব প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলও এ সম্বর্ধনায় শরীক হয়েছে।

নবীর গৃহে আরেক নবীর আগমন। সৌভাগ্য আর কাকে বলে। হজরত দাউদ আ. নিজের সৌভাগ্যে আল্লাহ্‌পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করলেন। তৎক্ষণাৎ পরমপ্রভুর সকাশে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

নবী পরিবারে ক্রমশ বড় হতে লাগলেন হজরত সুলায়মান আ.।

হজরত দাউদ আ. এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানে গঠিত হচ্ছে তাঁর মন মানস। হাঁটি হাঁটি পা পা করে কৈশোরে উপনীত হলেন শিশু নবী।

কালে যে তিনি নবীপদে অভিষিক্ত হবেন সেটা শৈশব থেকেই তাঁর আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। আর কৈশোরে এসে তা বৃদ্ধি পেয়ে সবার মনোযোগ আকৃষ্ট করলো। এ সময় হজরত সুলায়মান আ. নবীসুলভ মননশীলতার ছাপ সর্বত্র রাখতে শুরু করলেন। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ ঠিকরে যেনো নবুয়তের দ্যুতিকণা বিচ্ছুরিত হয়। তাঁর মৌনতা হয়ে ওঠে ভাবগম্ভীর কথকথা। পরিমিত কথন শুনে মনে হয় কোনো বিদগ্ধজনের মুখনিঃসৃত উপদেশমালা।

সময়ের সাথে সাথে নবুয়তের দীপ্তি শানিত হতে থাকে। বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ তাঁর প্রবল বেগে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রায়ই বালক সুলায়মান আ. সবাইকে অবাক করে দেন কোনো জটিল বিষয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ উপহার দিয়ে।

পিতা হজরত দাউদ আ.ও প্রসন্ন হন সব দেখে শুনে। আল্লাহ্পাকের জন্যে সকল প্রশংসা যিনি জ্বিন ইনসান ফেরেশতামণ্ডলীসহ যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন। সেই আদি অন্তহীন জাতপাকের জন্যেই তো আদি ও অন্তের সমস্ত স্তুতি।

উপযুক্ত উত্তরাধিকারীই তিনি দান করেছেন। নবুয়তের গুরুভার উত্তোলনের উপযোগী সন্তানই আল্লাহ্পাক তাঁকে দিয়েছেন। রাজ্যের উত্তরসূরীতো কিছু নয়। এ নিয়ে একজন নবীর ভাববার কিছু নেই। উম্মতের পথপ্রাপ্তির লক্ষ্যেই তাঁরা নবুয়ত নিয়ে সারাক্ষণ চিন্তান্বিত থাকেন। কী করে উম্মতের উভয়মুখী কল্যাণ সাধন করা যায় এ নিয়েই নবীগণ বিষাদিত থাকেন।

বালক বয়স থেকেই হজরত দাউদ আ. পুত্রকে কাছে কাছে রাখেন। একেবারেই তাঁকে দৃষ্টির আড়াল করতে চান না। ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া ছাড়াও উম্মতের তরবীয়তের সময়ও তাঁকে পাশে রাখেন। একান্ত অনুশীলনের মাধ্যমে হজরত দাউদ আ. গড়ে তুলতে চান তাঁর প্রাণাধিক পুত্রকে।

হজরত সুলায়মান আ.ও পিতার প্রবর্তিত শরীয়ত অতি অল্প সময়ে শিখে ফেলেন। যবুরের মর্ম জেনে নিয়ে সেভাবে আমল করেন। দারুণ মেধাবী ছাত্রের মতো দিন দিন শিক্ষক পিতার পূর্ণ অনুসারী হয়ে ওঠেন তিনি।

মাঝে মাঝে হতবাক হয়ে যান হজরত দাউদ আ. আপন সন্তানের আত্মিক গ্রহণক্ষমতা দেখে। বালক বয়সে এ যোগ্যতা নবী ছাড়া আর কারো হয় না। হতে পারে না।

দরবারের কর্মকাণ্ডেও হজরত দাউদ আ. হজরত সুলায়ান আ. কে উপস্থিত রাখেন। এখন থেকেই তিনি যেনো তাঁর কার্যবিধি, বিচারব্যবস্থা পুরোপুরি বুঝে নিতে পারেন। এসব ভেবে পুত্রের উপস্থিতিতেই নবী অনেক বিচারকার্য সমাধা করেন।

নয়

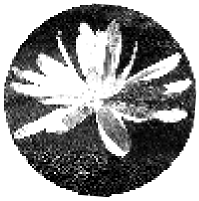

হজরত দাউদ আ. সূক্ষ্মদর্শী ন্যায় বিচারক।

সত্যনিষ্ঠায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বিচারপ্রার্থী কেউ তাঁর বিচার ব্যবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এমন নজীর নেই। লোকজন নানাপ্রকার অভিযোগ নিয়ে এলে তিনি মনোযোগ দিয়ে সেগুলো শুনে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন।

তখন হজরত সুলায়মান আ. থাকেন রাজদরবারে হাজির। প্রত্যক্ষ করেন তিনি পিতার গভীর জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ। এ সময় তিনি থাকেন গভীর অভিনিবেশ সহকারে। কোনোকিছুই যেনো তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। কোনো শব্দই যেনো তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয়ের বাইরে যেতে পারে না। বিশেষ ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রতিনিয়ত তাঁর মধ্যে ছলকে ওঠে।

নির্ধারিত সময়ে একদিন দু ব্যক্তি দরবারে উপস্থিত হলো।

হজরত দাউদ আ. এর কাছে তারা নালিশ করলো একে অপরের বিরুদ্ধে। নিয়ম মোতাবেক তাদের নালিশ শোনায় মনোনিবেশ করলেন হজরত দাউদ আ.। বাদী বিবাদী তাদের বক্তব্য পেশ করলো।

তাদের বক্তব্যের সারাংশ হলো এই– একজনের পশুপাল অপর ব্যক্তির ক্ষেতের ফসল বিনষ্ট করে ফেলেছে।

এ ব্যাপারে একটি তদন্ত করলেন বাদশাহ্ দাউদ আ.। তদন্ত শেষে তিনি জানলেন যে, পশুপালের মালিকের ত্রুটির কারণেই এমনটি হয়েছে। আর ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে পশুপালের মূল্যমানের সমান।

অপরাধ প্রমাণিত হলো। অপরাধের পরিমাণও নির্ণয় করা গেলো। এবার রায় ঘোষণায় কোনো সংশয় নেই। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রায় ঘোষণা করলেন হজরত দাউদ আ., 'শষ্যহানীর কারণে পশুপাল ক্ষেতের মালিককে দিয়ে দিতে হবে।'

এটা আইনতঃ অত্যন্ত সুন্দর মত। নির্ভুল তো বটেই। কিন্তু প্রত্যেক নির্ভুলের চেয়ে অধিকতর নির্ভুলতা রয়েছে। প্রত্যেক সুন্দরের অধিক সৌন্দর্য থাকে।

আল্লাহ্পাক ভালোকে আরো প্রকৃষ্টরূপে পর্যবসিত করলেন। তিনি হজরত সুলায়মান আ. এর যোগ্যতা প্রকাশ করলেন– বিচারটি অধিকতর সুন্দর রায়ে নিষ্পত্তি ঘটিয়ে।

এতোক্ষণ পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করছিলেন হজরত সুলায়মান আ.। পিতার বিচার দেখে তিনি চমৎকৃত হয়েছেন। অদ্ভুত রায় হয়েছে এটা। পিতার রায় মেনে নিয়েই এ ব্যাপারে বেশী উপযোগী একটি পন্থা অবলম্বনের জন্যে হজরত দাউদ আ.কে উপরোধ করলেন। বিনয়ের সাথে বললেন যে, এ পন্থা উভয় পক্ষের জন্যে অধিক হিতকর হবে।

হজরত সুলায়মান আ. নির্ণীত পন্থাটি হলো– পশুগুলো সাময়িকভাবে বাদীকে দেয়া হোক। সে এগুলোর দুধ ও পশম ইত্যাদি দিয়ে উপকৃত হতে থাক। এদিকে বাদীর ক্ষতিগ্রস্ত শষ্যক্ষেত্রের ক্ষতিপূরণ যেমন হয়ে যাবে; বিবাদীও তার প্রাণীগুলো থেকে চিরকালের জন্যে মালিকানা হারাবে না।

অভিমত প্রকাশ করে পিতার সম্মতির অপেক্ষায় রইলেন হজরত সুলায়মান আ.। বিলম্ব হলো না ইতিবাচক সাড়া পেতে। এ মতটি হজরত দাউদ আ. শুনেই খুব পছন্দ করেছেন। সাদরে গ্রহণ করলেন তিনি নবুয়তের উদীয়মান দিবাকর বালক পুত্রের রায়।

দশ

কিসের হৈ চৈ? —সচকিত হলো সবাই।

রাজদরবারের প্রবেশ পথের দিকে তাকালেন হজরত দাউদ আ.। দেখতে পেলেন দুজন রমণী ঝগড়ারতা অবস্থায় দরবারে প্রবেশ করলো। তাদের মধ্যে একজন বয়স্কা। অপরজন তরুণী। বয়স্কা রমণীটির কোলে একটি শিশু রয়েছে। এদেরকে দেখে কোনো কিছু অনুমান করা শক্ত। উভয়ে শিশুটিকে নিজের বলে দাবী করছে।

হজরত দাউদ আ. ইঙ্গিতে তাদেরকে ঝগড়া থামাতে বললেন। দরবারে হট্টগোল না থামালে কি হয়েছে বোঝা যাবে কীভাবে। কী হয়েছে তাদের জানতে চাইলেন নবী।

'আমরা ভ্রমণরতা ছিলাম। আমাদের দুজনেরই একটি করে শিশু ছিলো। একটিকে নেকড়ে বাঘ ধরে নিয়ে গিয়েছে। এখন এটিকে আমরা নিজের বলে দাবী করি।' রমণীদ্বয় নিজেদের ঘটনা প্রকাশ করলো।

ব্যাপারটি বেশ দূরূহ বলে মনে হচ্ছে দরবারীদের কাছে। রমণীদ্বয়ের দাবী প্রমাণ করা কঠিন বলে প্রতীয়মান হলো। কেননা তারা দুজন ব্যতীত এ ঘটনার অপর কোনো প্রত্যক্ষদর্শী নেই। আবার শিশুটিও এতো ছোট যে সেটার আকৃতি দেখে কোনো দূরবর্তী অনুমান করাও চলে না।

কিন্তু অবস্থা যাই হোক নবীকে যে কোনো সমস্যার মীমাংসা করতেই হয়। সব শুনে হজরত দাউদ আ. ভেবে চিন্তে বড় জনের পক্ষে রায় দিলেন। কারণ, শিশুটি রয়েছে রয়স্কা রমণীর অধিকারে। আর তরুণী তার সপক্ষে কোনো সাক্ষী উপস্থাপন করতে পারেনি। এতে বাহ্যিক শরীয়ত অনুযায়ী ফলাফল বয়স্কা মহিলার অনুকূলে গেলো।

রাজদরবারীরা রুদ্ধশ্বাসে এতোক্ষণ মামলা প্রত্যক্ষ করছিলেন। এখন সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যাক একটা সুরাহা হলো। যে ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো নিশ্চিন্তে দম ফেলবার ফুরসতও ছিলো না। প্রায়শই এমন অবস্থার সম্মুখীন তাদেরকে হতে হয়। অবশ্য সবারই পূর্ণ আস্থা রয়েছে হজরত দাউদ আ. এর প্রতি। তিনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তা নিশ্চিতই সকল জটিলতার নিরসন করবে।

বেরিয়ে যাচ্ছিলো রমণী দুজন দরবার কক্ষ ছেড়ে। সে সময় তাদের সাথে শাহজাদা হজরত সুলায়মান আ. এর দেখা হয়ে গেলো। ঘটনা কিছুটা আঁচ করতে পেরে তিনি তাদেরকে মোকদ্দমার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তারা নবীপুত্রকে ঘটনা পুরোটাই জানালো।

সব জেনে হজরত সুলায়মান আ. একজন পরিচারককে আদেশ করলেন, ‘একটি ছুরি নিয়ে এসো। তারপর শিশুটিকে দু’ভাগ করে কেটে এ দুজনকে দিয়ে দাও।’

একথা শুনে বড় রমণীটি নীরব রইলো। সে কোনো রকম উচ্চবাচ্য করলো না। যেনো কিছুই হয়নি চেহারায় এমন ভাব ফুটিয়ে তুললো। কিন্তু ছোটজনের কণ্ঠ থেকে শাহজাদার আদেশ শোনামাত্র আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো। হজরত সুলায়মান আ. এর কথা শুনে সে ভীত বিহব্বল হয়ে পড়লো। কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলো, ‘এরূপ করবেন না। এমনটি করবেন না। আমি আমার দাবী প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। শিশুটি ওকেই দিয়ে দিন।’

উপস্থিত কারো বুঝতে কষ্ট হলো না যে, বাচ্চাটি প্রকৃতপক্ষে কার। সবার চোখে ব্যাপারটি দিবালোকের মতো পরিষ্কার মনে হলো। আর বয়স্কা রমণীটির দাবীর অসারতাও নিমিষেই প্রমাণিত হলো। ফলে শিশুটিকে তার কাছ থেকে ফেরত নিয়ে তরুণীর কাছে দিয়ে দেয়া হলো।

যদিও দরবারের লোকজন হজরত সুলায়মান আ. বিচার বিশ্লেষণের সাথে পূর্বপরিচিত। তবু অভিনব এ আয়োজনে তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা তাঁর প্রতি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেলো। কতই বা বয়স হবে হজরত সুলায়মান আ. এর। বয়সে তিনি তো বালকমাত্র। সবাই বিস্মিত হলো তাঁর অতুলনীয় বিবেচনাবোধ দেখে। হজরত দাউদ আ.ও কম বিস্মিত হননি। বালক পুত্রের অসাধারণ প্রজ্ঞা তাঁকে পুলকিত করে। চমৎকার। এরকমটিই তো তিনি চান।

বাল্যকাল থেকেই নবীগণ তীক্ষ্ণধী হয়ে থাকেন। হজরত সুলায়মান আ.ও নবী। হজরত দাউদ আ. এর উত্তরাধিকারী। কাজেই তিনিও যে ছোট বেলায়ই অনন্য ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠবেন– এটাইতো স্বাভাবিক।

এগার

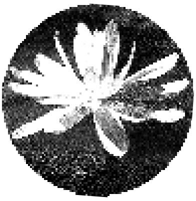

দীর্ঘকাল দ্বীনের প্রচার প্রসারে লিপ্ত ছিলেন হজরত দাউদ আ.। অন্তিম যাত্রার সময় প্রায় হয়ে এলো। প্রভু প্রিয়তমের ডাক কখন যে এসে যায়।

এক শুভ মুহূর্তে তিনি আল্লাহ্‌পাকের সন্নিধানে যাত্রা করলেন। নবুয়তের দিক নির্দেশকারী নক্ষত্র সরে গিয়ে স্থান করে দিলেন আরেক নক্ষত্রের। যাত্রার প্রাক্কালে পুত্রকে কাছে ডেকে জরুরী কথাগুলো আবারো স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন হজরত দাউদ আ.।

হজরত সুলায়মান আ. এতোদিনে পরিণত বয়সে পৌঁছে গিয়েছেন। যুবক বয়সে তিনি পিতার বিয়োগ প্রত্যক্ষ করলেন। আহা পিতা! স্নেহময় পিতা। কতো স্মৃতি অম্লান হয়ে আছে পিতার সান্নিধ্যে।

যুবক নবী এবার নবুয়তের দায়িত্বভার বহনের পূর্ণ উপযোগী হয়েছেন। লাভ করলেন তিনি পিতার উত্তরাধিকার। এটা ধনসম্পদের উত্তরাধিকার নয়। এ উত্তরাধিকার নবুয়ত ও বাদশাহীর।

কারণ, রসূলে পাক স. এরশাদ করেছেন, 'আমরা নবীর সম্প্রদায়। আমাদের ধনসম্পদের ওয়ারিশ হয় না। আমরা যা কিছু ত্যাগ করে যাই তা ছদকা রূপে গণ্য হয়।'

পিতার মৃত্যুতে ভেঙে পড়লেন না হজরত সুলায়মান আ.। সচরাচর যা দেখা যায় প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। নবীদের ক্ষেত্রে তা হয় না। আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছায় যাঁরা সর্বাধিক সমর্পিত তাঁরা কীভাবে এমনটি করতে পারেন। যাঁরা নবীগণের একনিষ্ঠ অনুসারী তাঁরাও তো ভেঙে পড়েন না। বিরহে মুহ্যমান হয়ে তাঁরা নিজেদের কর্তব্যকর্ম ভুলে যান না। প্রিয়জনের মৃতদেহ পাশে রেখেও তাঁরা নির্বিকারভাবে অর্পিত দায়িত্ব সমাধা করেন।

নবীপদে অভিষিক্ত হয়ে হজরত সুলায়মান আ. তাঁর পিতার মতো বিনয়ী ভাষণে বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্যে শোভনীয় যিনি স্বীয় বহু মুমিন বান্দার উপর আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন।'

'হে লোক সকল। আমাকে পাখিদের বুলি সম্বন্ধীয় জ্ঞান দান করা হয়েছে। আর আমাকে দরকারী সমস্ত কিছুই দান করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা আমার প্রতি আল্লাহ্‌পাকের সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।' সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানকালে তিনি একথা বললেন।

শ্রোতামণ্ডলী অবাক হয় না তাঁর কথা শুনে। এতোদিন ধরে এরা হজরত দাউদ আ. এর রাজত্বে বসবাস করছে। দিনের পর দিন নবীর বিনম্র আচরণ লক্ষ্য করেছে। মানুষ যে কত বিনয়ী হতে পারে তা থেকে তারা অনবধান নয়। আর হজরত সুলায়মান আ. এর জীবন চরিতও অজানা নেই তাদের। ফলে শ্রোতরা কেউ বিস্ময় প্রকাশ করে না। নীরবে নবীর কথা শুনে যায় কেবল।

আল্লাহ্‌পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নবীগণের দৃষ্টান্ত গভীরভাবে লক্ষণীয়। এ ক্ষেত্রেও তাঁদের চেয়ে অগ্রণী কেউ নয়। হতে পারেনা। প্রতিপালকের ভয়— প্রতিপালকের আদেশে সন্তুষ্টি তাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে জাগরুক থাকে সারাক্ষণ।

মানুষ ভুলে যায়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানব স্বভাবে অরুচিকর মনে হয়। সামান্য পার্থিব অগ্রগতি মানুষকে মোহান্ধ করে ফেলে। অধিক পরিমাণে জাগতিক স্বার্থ চরিতার্থ হলে তো কথাই নেই। ফেরাউন, নমরূদ ও শাদ্দাদের অনুসরণে লিপ্ত হয়ে পড়ে মানুষের দল। ভুলে যায় তারা নবীর উম্মত। ভুলে যায় একথা যে, আল্লাহ্‌পাকের সার্বক্ষণিক স্মরণ ছাড়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্ভব নয়।

বিস্তৃতির অকুল পাথারে আছড়ে পড়ে মানবতা। সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে শয়তান। বাসা বাঁধে সে মানুষের কলুষিত অন্তরে।

বার

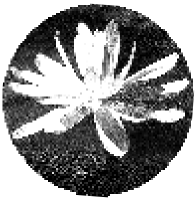

নবীপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হজরত সুলায়মান আ. হাত তুললেন মহান প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে। বিনয়াবনত হয়ে পড়েন এসময় নবী। কাতর স্বরে বলতে থাকেন, 'হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন।' নিষ্কলুষ নবী বলে যান, 'আর আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন যা আমার পরে কারো জন্য সম্ভব না হয়।'

সাড়া পেলেন নবী তাঁর প্রার্থনার। আল্লাহ্‌পাক গ্রহণ করেছেন তাঁর দোয়া। দান করলেন তিনি তাঁকে অনুপম রাজত্ব। যা তাঁর পরে কারো ভাগ্যে হয়নি। মানুষতো তাঁর অনুগত রয়েছেই। এছাড়াও জ্বিনজাতি, বায়ু এবং অন্যান্য প্রাণীদের উপরও আল্লাহ্‌পাক তাঁকে কর্তৃত্ব দান করলেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌পাক বলেন, 'আর আমি তাঁর জন্যে বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছি। যা তাঁর আদেশে মৃদু গতিতে প্রবাহিত হয়ে থাকে– যেদিকে তিনি পৌঁছতে ইচ্ছা করেন।'

বায়ুকে হজরত সুলায়মান আ. এর আদেশানুগত করে দেয়া হলো এমনভাবে যে, তিনি যখন ইচ্ছা করেন তখন বায়ুপ্রবাহ কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করতে পারেন। তাঁর ভ্রমণকৃত পথের পরিমাণ হয় সকালে একমাসের পথ ও সন্ধ্যায় একমাসের পথ। অর্থাৎ একজন অশ্বারোহীর একমাসের বিরামহীন পথ তিনি এক বেলায় অতিক্রম করেন। বায়ু তাঁর আদেশে প্রবল গতিশীল হওয়া সত্ত্বেও মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হয়। এতেই তিনি সামান্য সময়ে অনেক পথ পাড়ি দেন।

আল্লাহ্‌পাক নবীর উদ্দেশ্যে আরো বলেন, 'আর আমি অবাধ্য জ্বিনদের মধ্যে থেকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম। যারা তাঁর জন্যে সমুদ্রে ডুব দিতো। তা ছাড়া আরো অনেক কাজ করতো আমি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতাম ও সংরক্ষণ করতাম।'

জ্বিনজাতি আল্লাহ্‌পাকের অন্যতম সৃষ্টি। আগুনে তৈরী এ জাতি ভীষণ শক্তিশালী হয়ে থাকে। বিভিন্ন শ্রমসাধ্য কাজ যা মানব শক্তিতে কঠিন মনে হয়– তা এরা অনায়াসে সম্পন্ন করতে পারে। মানুষকে যেমন পরলোকে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে তেমনি জ্বিন সম্প্রদায়েরও আখেরাতে বিচার হবে।

আল্লাহ্পাক ইবাদত প্রসঙ্গে মানব এবং জ্বিনজাতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'আমি জ্বিন এবং মানুষকে আমার ইবাদত ভিন্ন অন্য কোনোকিছুর জন্যে সৃষ্টি করিনি।' মানুষের মাঝে যেমন ভালোমন্দ উভয় প্রকার রয়েছে। জ্বিনদের মধ্যেও বাধ্য-অবাধ্য দু'টি শ্রেণী রয়েছে।

জ্বিনদেরকে আল্লাহ্পাক হজরত সুলায়মান আ. এর একান্ত আজ্ঞাবহ করে দিলেন। নবী এসব দানবদের নানা কাজে ব্যবহার করেন। কখনো আদেশ করেন তাদেরকে অতল সমুদ্রে ডুব দেয়ার জন্য। সাথে সাথে পালিত হয় তাঁর হুকুম। সাগর থেকে তুলে আনে জ্বিনজাতি কত রকম মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী। জানা অজানা কত মনি মুক্তা। এসব মহার্ঘ বস্তু আহরণের মধ্য দিয়ে দিন দিন সমৃদ্ধ হয় হজরত সুলায়মান আ. এর রাজ্য। উপকৃত হয় রাজ্যের মানুষ।

নির্মাণ শিল্পে জ্বিনদের ভূমিকা এসময় অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। বিশাল ইমারত বা সুরম্য ভবন তৈরী করতে মানুষ অনেক শ্রম ও সময় ব্যয় করে। অবশ্য মানব দেহের সামর্থ্য যে রকম, কাজ তো সে অনুপাতেই হবে। জ্বিনদের অতো শ্রম ও সময় খরচের বালাই নেই। ভারী থেকে ভারী কাজ তারা নিমেষেই সম্পন্ন করে।

দালান কোঠা তৈরী ছাড়াও নবী তাদেরকে অন্যান্য কাজে ব্যবহার করেন। উন্নত মানের অস্ত্রপাতি, রন্ধন শিল্পের বড় বড় ডেগ ইত্যাদি জ্বিনদের দ্বারা সময়মতো প্রস্তুত করিয়ে নেন। হজরত সুলায়মান আ. এর আদেশ পেলেই এ শক্তিমান জাতি কাজ করতে থাকে।

কি অদ্ভুত রাজ্য লাভ করেছেন হজরত সুলায়মান আ.। কখনো তিনি সদলবলে বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ান। কখনো বা জ্বিনদেরকে দিয়ে নানা কাজ করিয়ে নেন। অপূর্ব সব মোজেজা আল্লাহ্পাক তাঁকে দান করেছেন।

এতোকিছুর পরও নির্মাণ কাজে একটি সমস্যা বার বার হজরত সুলায়মান আ. কে ভাবিয়ে তুললো। বহু প্রাসাদ এ যাবত তিনি বানিয়েছেন বটে। তবু এগুলোর নির্মাণ সামগ্রী তাঁর কাছে যথাযথ মনে হচ্ছে না। স্থাপত্য বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ নবী ভাবেন, নির্মাণ শিল্পে প্রচলিত সামগ্রী চুন সুরকির পরিবর্তে কি উদ্ভাবন করা যায়।

পুরাকাল থেকে এসব উপাদান কাজে লেগে আসছে। নিজ অভিজ্ঞতা থেকে নবী জানেন, এগুলো দালান কোঠা বা প্রাসাদকে মোটেও দীর্ঘস্থায়ী করে না। এসব ব্যবহার করে কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যায় না। কাজেই প্রচলিত রীতিতে তাঁর মনস্কামনা পূরণ হবার নয়। তাহলে-?

আল্লাহ্পাক এ নিয়ে হজরত সুলায়মান আ. এর সকল ভাবনার অবসান করলেন। তিনি তাঁকে গলিত ধাতুর ঝর্ণা দান করলেন।

ভূ-পৃষ্ঠের অভ্যন্তরে বহু ধাতু রয়েছে। এসব ধাতু যুগ যুগ ধরে লোকচোখের অন্তরালে পড়ে আছে। লুকায়িত মজুদ ধাতুগুলো আল্লাহ্‌পাক নবীর জন্যে প্রকাশ করে দিলেন। শুধু সন্ধান দিলেন তাই নয়– সেগুলো তাঁর কাছে অনায়াসলব্ধ করে দিলেন। গলিত ধাতু তামা পানির প্রস্রবণের মতো ভুগর্ভ থেকে প্রয়োজন মাফিক বেরিয়ে আসতে লাগলো।

এবার আর ইমারত নির্মাণে কোনো প্রতিবন্ধকতা রইলো না। ইমারতের স্থায়ীত্বের ব্যাপারেও এখন থেকে আর চিন্তা করতে হবে না। চুন সুরকির পরিবর্তে গলিত তামার ব্যবহার এদিকটা নিশ্চিত করেছে। গলিত ধাতুর বহুল প্রচলনে নির্মাণ শিল্প নতুন মাত্রা পেলো।

বিস্ময়ের বুকে বিস্ময় সঞ্চিত হতে চললো।

নবোৎসাহে হজরত সুরায়মান আ. স্থাপত্য কলায় অবদান রাখতে শুরু করলেন। মহান স্থপতি নতুন মোজেজা নিয়ে কাজে নামলেন। শুরু হলো নতুনতর সভ্যতা।

সভ্যতার বিকাশ তো নবীদের মাধ্যমেই হয়। নবুয়তের সময়সীমায় নবী হন সব ক্ষেত্রে আদর্শ অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। নবী হন একই সাথে পবিত্রকারী, বিজ্ঞানী, স্থপতি সবকিছু।

জড়বুদ্ধিধারী ব্যক্তিরা এসব মহাকীর্তি অনুধাবন করতে গিয়ে পদে পদে হোঁচট খায়। কেউ কেউ নবীদের গড়া অতি উঁচু মানের স্থাপত্য দেখে ভিন গ্রহের মানুষের অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ায়। যারা নিজ ঐতিহ্য সম্পর্কে অনাগ্রহী তারা তো রহস্যের চোরাগলিতে হারিয়ে যাবেই। অন্ধকার দিয়েতো আর অমানিশা দূর হয় না। এর জন্যে চাই আলো।

তের

প্রাচীন নগরী বায়তুল মুকাদ্দাস।

তিন মহাদেশের কোলে অবস্থিত এ নগরী। এ পবিত্র ভূ-খণ্ডে জড়িয়ে আছে কতো অনন্য অতীত। কতো মহাপুরুষের পদচারণায় ধন্য হয়েছে বায়তুল মুকাদ্দাস তার গোণাগুণতি নেই।

বহু আগে এখানটায় হজরত সুলায়মান আ. এর পূর্বপুরুষ হজরত ইয়াকুব আ. পদার্পণ করেছিলেন। জায়গাটা খুব ভালো লেগেছিলো তাঁর। এরকম একটি স্থানই তো তিনি খুঁজছিলেন। মসজিদ নির্মাণ করার জন্যে এ অঞ্চলটি অনুকূল বলেই মনে হচ্ছে।

হজরত ইয়াকুব আ. বায়তুল মুকাদ্দাসে একটি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। এটাই অস্তিত্বের জগতে দ্বিতীয় মসজিদের সূচনা। প্রথম মসজিদ হচ্ছে কাবা শরীফ। আর নির্মীয়মাণ এই নতুন মসজিদটি দ্বিতীয়। এর নাম আল আকসা।

নবীর স্থাপিত মসজিদটিকে উপলক্ষ্য করে লোক সমাগম হতে থাকে। এর চারপাশে গড়ে ওঠে অগুণতি বসতি। লোকজনের ক্রমবর্ধমান চাপে আস্তে আস্তে বায়তুল মুকাদ্দাসের সীমানা বৃদ্ধি পায়। ক্ষুদ্র জনপদ সম্প্রসারিত হয়ে রূপ নেয় শহরে।

বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদটির ভিত্তি স্থাপন করার পর ভূমধ্যসাগরে কতো তরঙ্গের উত্থান পতন হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বহু আগেই ইন্তেকাল করেছেন হজরত ইয়াকুব আ.। এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে এ নগরীর।

হজরত সুলায়মান আ. এর আমলে এসে প্রায় ভগ্নদশা হয়েছে বায়তুল মুকাদ্দাসের। কালের করাল থাবায় এখানকার অধিকাংশ দালান আজ জীর্ণ হয়ে পড়েছে। কোনো কোনো বাড়ীঘর তো বার্ধক্যের ভারে পড়নোন্মুখ।

বৃদ্ধ নগরী বায়তুল মুকাদ্দাসের পুনর্নির্মাণ আবশ্যক হয়ে উঠেছে। বিপদজনক দালান কোঠাগুলো পুনর্গঠন না করলেই নয়। যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সময়মতো ব্যবস্থা না নিলেই নয়।

হজরত সুলায়মান আ. নগর পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন অনুভব করলেন। বায়তুল মুকাদ্দাস তাঁকে ভাবিয়ে তুললো। সুপ্রাচীন নগরীটি তিনি ঢেলে সাজাতে চাইলেন।

নবী চাইলেন প্রথমে মসজিদে আকসা পুনর্নির্মাণ করতে। তারপর মসজিদকে ঘিরে বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করবেন। এভাবে নগরীটি তার পূর্ব মর্যাদায় ফিরে যাবে। হজরত ইয়াকুব আ. এর পত্তনকৃত এলাকাটি আবার একটি হাস্যোজ্জ্বল জনারণ্যে রূপান্তরিত হবে।

এ নগর অপরূপ করে গড়তে হলে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান পাথর প্রয়োজন। বড় বড় সুদৃশ্য প্রস্তরখণ্ড না পেলে মনমতো বায়তুল মুকাদ্দাস সাজানো যাবে না। এ অঞ্চলে এসব দরকারী জিনিসপত্র কোথায়? যা কিছু পাওয়া যায় তা এতো অপ্রতুল যে, এ কাজের একাংশও সেগুলো দিয়ে পূরণ হবে না।

দূরদূরান্তরের এলাকা থেকে পাথর সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অনুকূল নয়। তাতে কি। কুছ পরোয়া নেই।

দ্রুতগামী ও শক্তিশালী জ্বিন সম্প্রদায় তো রয়েছেই। তাদেরকে আদেশ করলেই তো হয়। জ্বিনদেরকে কাজে লাগানোর এটাই মোক্ষম সময়।

জ্বিনদেরকে হুকুম করলেন হজরত সুলায়মান আ. নির্মাণ উপকরণ নিয়ে আসার জন্যে। আদেশ পেয়েই তারা হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগলো নির্দেশিত সামগ্রী। নিয়ে এলো প্রয়োজনীয় মালমাত্তা। সেগুলো নবী এক জায়গায় জমা করতে বললেন। একত্রিত সামগ্রী বিরাট স্তূপে পরিণত হলো। বাহারী পাথরে ভরে উঠলো নির্মাণস্থল। রঙ বেরঙের কতই না প্রস্তর নিয়ে এসেছে দানবরা। মনলোভা পাথরগুলো এক নজরেই দর্শনার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বাধ্যগত জ্বিনদেরকে নির্দেশ দিলেন হজরত সুলায়মান আ. মহানগরী পুনঃনির্মাণ শুরু করার জন্যে। বিরাটকায় পাথর সংস্থাপন করে নির্মাণের সূচনা করা হলো। পাথরের বুকে পাথর বসিয়ে অট্টালিকার পর অট্টালিকা তৈরি হতে লাগলো জ্বিনদের হাতে।

মসজিদসহ এর আশপাশ ক্রমেই বদলে যাচ্ছে। কাজের অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন নবী। পরম নিষ্ঠার সাথে অতিকায় জ্বিনরা কাজ করে চলেছে। ডানে বামে কোনো দিকে যেনো তাদের নজর নেই।

বশীভূত জ্বিন সম্প্রদায় স্থাপনা জগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলো। রেখে দিলো তারা বিস্ময় পুঁতে বায়তুল মুকাদ্দাসের মাটিতে। তাদের গড়া অতি উঁচু ইমারতসমূহ ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য দাঁড়িয়ে রইলো অবাক ঐতিহ্য হয়ে।

চৌদ্দ

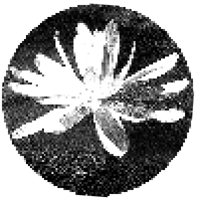

অভিযানে বেরোবেন হজরত সুলায়মান আ.।

বিপুল আয়োজন এ অভিযাত্রার। কাতারবন্দি হয়ে লোকলস্কর সমবেত হলো তাঁর পেছনে। নবী বাহিনীতে মানব সৈনিক ছাড়াও রয়েছে জ্বিন এবং পাখির বিরাট দল। তিন জাতির সম্মিলিত বাহিনী এখন সর্বাত্মক প্রস্তুত। সকলেই নবীর নির্দেশের অপেক্ষায়।

শত সহস্র সেনানী চলতে শুরু করলো হজরত সুলায়মান আ. এর ইশারায়। চলছে তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে।

এ বাহিনীর সমন্বয় রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। তা না হলে বিশাল জনসমুদ্র যে কোনো সময় এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। হজরত সুলায়মান আ. নিজেই শৃংখলার তদারকি করেন। অগ্র-পশ্চাতের খোঁজ খবর নেন।

দিগন্তপ্লাবি পাখির দল সেনাদলকে ছায়া প্রদানে নিয়োজিত রয়েছে। এ কারণে প্রখর রৌদ্র কিরণ নবী বাহিনীকে তেমন ঘর্মাক্ত করতে পারে না। পথিমধ্যে ভারি কাজের দরকার হলে অসুবিধা নেই। জ্বিনজাতি সদাপ্রস্তুত নবী বাহিনীর খেদমতে।

বিশেষ প্রজাতির পাখি হুদহুদ। এ পাখি পানি অনুসন্ধানের জন্যে সারাক্ষণ চেষ্টারত। ভূগর্ভস্থ পানির সন্ধান দেয়াই এর কাজ। নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই হুদহুদ ভূগর্ভস্থ পানির খোঁজ নিতে সক্ষম। পানির খোঁজ পাওয়া গেলেই এ পাখি হজরত সুলায়মান আ. কে তা জানিয়ে দেয়। তারপর কাজ অতি সহজ। নবী বাহিনীভুক্ত প্রকাণ্ড জ্বিনেরা মাটি খুঁড়ে পানি বের করে আনে। সে পানি দ্বারা সবারই পিপাসা নিবৃত্ত হয়।

এগিয়ে চলেছে সম্মিলিত সৈনিকদল। বিচিত্র প্রাণীকুলের একত্র সমাবেশ। সবকিছু মিলিয়ে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য তৈরী হয়েছে। ভূচর খেচর জীবের এমন সম্মেলন এ নবীর সময়ের আগে কেউ দেখেনি। বিজন বন-উষর মরু পাড়ি দিচ্ছে এরা অবলীলায়।

চলতে চলতে হজরত সুলায়মান আ. তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে একটি ময়দানের নিকটবর্তী হলেন। এ ময়দানে পিঁপড়াদের এক বিরাট দল বাস করে। মাঠময় তারা ছাড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বিচরণ করছে যত্রতত্র। লোকজন খুব একটা এখানে পা দেয়না বলেই হয়তো তারা বেশ নিশ্চিন্তে হাঁটাচলা করছে।

পিঁপড়াদের দলপতির নজর এড়ালো না ব্যাপারটি। দূর থেকেই সে অনুমান করে নিতে পারলো যে, বিপদ আসন্ন। হজরত সুলায়মান আ. ও তাঁর দল মাঠের কাছাকাছি আসতেই সে হয়ে পড়লো শংকিত। নিজ দলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে ভেবে দলপতি যেনো ঘাবড়ে গেলো। ভাবলো এভাবে পিঁপড়ারা হেঁটে বেড়াতে থাকলে নির্ঘাত মারা পড়বে সবাই। আগুয়ান বাহিনীর পদতলে পিষ্ট হওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো উপায়ই থাকবে না।

‘হে পিঁপড়ার দল। তোমরা নিজেদের নিরাপদ স্থানে চলে যাও।’ পিঁপড়ার দলপতি তার নিজস্ব ভাষায় চিৎকার করে উঠলো, ‘হজরত সুলায়মান আ. এর বাহিনী যেনো তোমাদেরকে পিষ্ট না করে ফেলে।’

হজরত সুলায়মান আ. তাঁর দল থেকে এগিয়ে আছেন কিছুটা। শুনে ফেললেন তিনি পিঁপড়ার সতর্কবাণী। অভিভূত হয়ে গেলেন নবী। কি অদ্ভুত কাণ্ড। সামান্য

প্রাণীর আত্মরক্ষার কি সুন্দর প্রচেষ্টা। এটা দেখে অবাক না হয়ে পারা যায়। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো– পিঁপড়ার দলনেতা নিজের জন্যে নয়, দলের জন্যে উদ্বিগ্ন।

আল্লাহ্‌পাকের প্রশংসা সমস্তই। যিনি ক্ষুদ্র জীবকুলের মধ্যে সচেতনতা দান করেছেন। আত্মরক্ষার সহজাত গুণাবলী দিয়ে দিয়েছেন।

প্রতিপালকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে পড়ে হজরত সুলায়মান আ. এর। এর দরকার ছিলো। পরওয়ারদিগারের প্রশস্তি প্রকাশের জন্যে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করা ভীষণ প্রয়োজন ছিলো।

করুণা রাজ্যে হাত প্রসারিত করলেন নবী। অনির্বচনীয় মিনতি ঝরে পড়ে তাঁর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে, 'হে প্রভু পরওয়ারদিগার! আমাকে এবং আমার মাতাপিতাকে যে সমস্ত নেয়ামত দান করেছেন– তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সামর্থ্য আমাকে দান করুন এবং আপনার সন্তুষ্টির উপর সৎকাজ করার সামর্থ্যও দান করুন ও আপনার করুণায় আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভূত রাখুন।'

নবী ছাড়া কে পারে এমন করে অবনত হতে। শক্তি, অর্থ, ক্ষমতার প্রাচুর্য মানুষকে কোথায় না নিয়ে যায়। বিপথ ভাটির স্রোতে ভেসে যায় মানবতা। অথচ জানা উচিত, আত্মম্ভরিতার প্রতিষেধকই হচ্ছে বিনয়াবনত হওয়া। যে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে অবনত হয় আল্লাহ্‌পাক তাঁকে উচ্চ করেন।

পনের

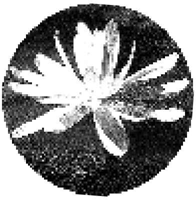

অতুলনীয় সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহ্‌ সুলায়মান আ.।

তাঁর দু'পাশে সারিবদ্ধ আসন অধিকার করে আছেন মন্ত্রীপরিষদ। সচিব থেকে শুরু করে সাধারণ রাজকর্মচারী রয়েছেন এখানে উপস্থিত। রয়েছেন সবাই নবী বাদশাহ্‌র নির্দেশ পালনের অপেক্ষায়।

আরো রয়েছে দরবারে দণ্ডায়মান বিভিন্ন পদমর্যাদার সেবক। মানবসম্প্রদায়-ভুক্ত সেবক তো রয়েছেই। জ্বিনজাতির প্রতিনিধিবর্গও এখানে অনুপস্থিত নেই। নানাগোত্রের ভূচর ও আকাশচারী জীবরা তো রাজ দরবারের অন্যতম আকর্ষণ।

জাঁকজমকপূর্ণ দরবার।

অথচ পুরো দরবার শুন্‌শান। নীরব। নিথর যেনো সবাই। যৎসামান্য মুদ্রাপতনও যেনো চমকে দেবে সবাইকে। এমনই বাদশাহ্ সুলায়মান আ. এর প্রভাব তাদের উপর। নবীর প্রতি ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধাবোধ দরবারীদেরকে নির্বাক করে রেখেছে।

মৌনতা ভাঙলো হজরত সুলায়মান আ. এর জিজ্ঞাসায়। চিরাচরিত অভ্যাস মতো নবী সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ভালোমন্দ খবরাখবর নিলেন সবার। তারপর ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রজাদের খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। মানব, দানব, পশুপাখি কেউই তাঁর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি থেকে বাদ পড়ছে না।

তল্লাশির এক পর্যায়ে নবী লক্ষ্য করলেন, পাখিদের মধ্যে অন্যতম হুদহুদ এখানে উপস্থিত নেই। কি ব্যাপার! সে উপস্থিত নেই কেনো? কি হয়েছে হুদহুদের?

নবী হুদহুদের অনুপস্থিতির বিষয়ে প্রশ্ন করলেন সবাইকে। কিন্তু জবাব নেই। নিরুত্তর রইলো সবাই। কেউ জানে না হুদহুদ কোথায়। কিইবা তার হাল হকিকত।

–'হুদহুদকে দেখছি না কেনো?' বলেন হজরত সুলায়মান আ.

–'সে কি এলো না।' বলে যান নবী, 'যদি তাই হয়। তবে আমি তাকে কঠোর শাস্তি দেব। কিংবা জবাই করে ফেলবো। অথবা সে আমার কাছে তার গরহাজির থাকার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা প্রদান করুক।'

চমকে উঠলো সবাই। বাদশাহ্র উক্তি শুনে দরবারের কারো কারো হৃৎকম্প দেখা দিলো। কেউ বা হুদহুদ পাখির পরিণাম চিন্তা করে ঘেমে নেয়ে উঠলো। রাজরোষে পতিত হলে নিস্তার আছে কারো?

সাধারণ কোনো রাজা বাদশাহ্ হলেও একটা কথা ছিলো। কোনোভাবে কৌশলে বেঁচে যাওয়ার উপায় হয়তো বেরিয়ে যেতো। কিন্তু এটাতো কোনো দুনিয়াদার বাদশাহ্র দরবার নয়। আল্লাহ্র নবী স্বয়ং দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এখানে। তাঁর বিরাগভাজন হওয়া মানেই আল্লাহ্পাকের অসন্তুষ্টিতে নিমজ্জিত হওয়া। সত্য ওজর না থাকলে খারাবী আছে হুদহুদের অদৃষ্টে। ভাবছে দরবারের লোকেরা– কি না জানি আছে তার কপালে!

এসব ভাবনা ভয়ের রেশ মিলিয়ে না যেতেই হুদহুদ এসে পড়লো।

এসেই প্রবেশদ্বারে থমকে গেলো সে। থমথমে দরবার দেখে সাংঘাতিক সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো হুদহুদ। কোথায় যেনো খটকা লাগছে। কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়। ঘটনা যে তাকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে তাও সে অনুমান করতে পারলো।

ওজর পেশ করার ভঙ্গিতে হুদহুদ বলে উঠলো, 'আমি এমন একটি বিষয়ের সংবাদ নিয়ে এসেছি— যা আপনি অবগত নন হজরত। আমি সাবা অঞ্চল থেকে নিশ্চিত তথ্য নিয়ে আপনার সমীপে পৌঁছেছি। সেখানে আমি এক রমণীকে সে

রাজ্যের রাণীরূপে দেখেছি। যিনি সেখানকার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তার অধিকারে বহুবিধ সাজ সরঞ্জাম রয়েছে এবং একটি বিশেষ কারুকাজকৃত সিংহাসনও তার রয়েছে। সে এবং তার সম্প্রদায় আল্লাহ্তায়ালাকে ছেড়ে সূর্যের উপাসনায় লিপ্ত রয়েছে। শয়তান তাদের কাজগুলো তাদের কাছে সুশোভিত করে প্রদর্শন করেছে। ফলে সে তাদেরকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছে। তাই তারা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে হুদহুদ থামলো। প্রাণভরে দম নিতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

হুদহুদের নিয়ে আসা তথ্য শুনে হজরত সুলায়মান আ. বললেন, 'আমি দেখবো তুমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা। তুমি আমার পত্র নিয়ে সে রাণীর কাছে যাও। এটি তার সামনে রেখে দূর থেকে লক্ষ্য করবে সে কি উত্তর প্রদান করে।'

ষোল

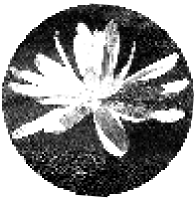

সাবা। একটি সমৃদ্ধ রাজ্যের নাম। মধ্যমাকৃতির এ দেশটি ইয়ামানের রাজধানী সানার অদূরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছে। সাবার আরেক পরিচিতি মারেব নামে। তবে এ যুগে সাবা নামেই সমধিক পরিচিত।

সাবা নামটি এ অঞ্চলের একজন কৃতি পূর্বপুরুষের নাম। ঠিক নাম নয়। এটা ছিলো তার উপাধি। যার বীরত্বের বহু কাহিনী আজো এলাকার লোকমুখে শোনা যায়। ক্ষণজন্মা এ ব্যক্তিটি সাবা রাজ্যের কল্যাণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তার কৃতিত্বভাস্বর কর্মকাণ্ডের কথা সাবাবাসী গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে আজো স্মরণ করে।

সাবার দশ দশটি পুত্র সন্তান জন্মেছিলো। সকলেই পিতার প্রযত্নে লালিত পালিত হন। বড় হয়ে উঠলে পরে তাদেরও খ্যাতি দিকে দিকে ছড়াতে থাকে। পিতার মতো না হলেও সুনাম তাদের কম ছিলো না। তাদের কাছেও সাবা জাতি ঋণী। পরবর্তীকালে এদের মধ্য থেকে ছয়জন ইয়ামানে এবং চারজন শামদেশে বসবাস করতে থাকেন। জাতিকে শোক সাগরে ভাসিয়ে একসময় সাবা ও তার পুত্ররা ধরাপৃষ্ঠ ত্যাগ করেন।

সুউচ্চ পর্বতবেষ্টিত দেশটি সহজেই পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করে। চারদিকে দৃষ্টিনন্দন সবুজ আর সবুজ। মাঝে মাঝে মনোহর হলুদ, লাল আর নীলের ছোপ পটে আঁকা শিল্পকর্মের কথা মনে করিয়ে দেয়। নাড়া দেয় মানুষের শিল্পীসত্তায়। কোন মহান শিল্পীর গড়া এসব?

দেশময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাগানগুলো মিলে যেনো মহাউদ্যান রচনা করেছে। ফুলশোভিত বাগানগুলো কাব্যের উপাদান সরবরাহ করে কবির ভাবনায়।

কিন্তু কিছুকাল আগেও সাবাবাসীদের দুঃখ দুর্দশার অন্ত ছিলো না। ছিলো না সমতল ভূমিগুলো এমনি উদ্যানশোভিত। বর্ষণোত্তর পাহাড়ী ঢল তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল করে দিতো তখন। অঝোর বৃষ্টিপাত বিভিন্ন গিরিপথ বেয়ে মারেব এলাকার উঁচু দু'পর্বতের মধ্যস্থলে জমা হতো। তারপর সেখান থেকে নেমে আসতো সমভূমিতে। পানির তোড়ে ভেসে যেতো দেশের যতো উন্নয়ন পরিকল্পনা। বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন থাকায় সারা বছর কৃষি কাজ করার যো থাকতো না কারো।

আবার প্লাবনপরবর্তী সময়ে সমতল প্রান্তর হয়ে পড়তো শুকনো খট্‌খটে। মাঠ ঘাট হয়ে যেতো চৌচির। কারণ, বন্যার পানির কিছু অংশ নিকটস্থ মরুভূমি শুষে নিতো আর বাকী অংশ চলে যেতো সাগরে। সেজন্যে পুনর্বার দেশ জলমগ্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত সাবা পরিণত হতো প্রায় মরুভূমিতে।

কখনো অঢেল পানি। কখনো বা পানিশূন্যতা। এ দু' অবস্থার নাগর দোলায় তারা হয়েছিলো সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার। সুস্থ জীবনবোধ তাদের ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে আসছিলো। বিকারগ্রস্ত মানুষ হয়ে উঠছিলো যেনো তারা।

সাবা দেশীয় কেউ কেউ এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের ভিন্ন উপায় খুঁজলো। বিদেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালো অনেকেই। এরকম দুর্বিসহ জীবন যাপনের চেয়ে প্রবাস জীবনইতো শ্রেয়। যাদের বিদেশযাত্রার সঙ্গতি নেই তারা সাবায় পড়ে থেকে থেকে চরম দুর্গতির মধ্যে কালাতিপাত করছিলো।

ভাবনার ঘোড়া লাগামহীন হয় বেশীরভাগ সময়।

সাবার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাদের দীর্ঘদিনের ভাবনায় লাগাম বাঁধতে চললেন। অনেকদিন থেকেই তারা ভাবছিলেন দেশের সার্বিক বন্যাপরিস্থিতি নিয়ে। চিন্তার তাদের অন্ত ছিলো না। কী করে এই ভয়াবহ অবস্থার উত্তোরণ ঘটে। কী করলে অতিরিক্ত পানি আটকানো যাবে। আর কীভাবেই বা শুষ্ক মওসুমে জমির আর্দ্রতা রক্ষা করা যাবে। এসব দুশ্চিন্তা সাবার নেতাদের ব্যতিব্যস্ত করে রাখতো সারাক্ষণ।

দীর্ঘদিনের গবেষণা ফলপ্রসূ হলো অবশেষে।

স্থির হলো আলোচনার মাধ্যমে যে, দু' পাহাড়ের মাঝখানে বাঁধ নির্মাণ করলে এ সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

গবেষণার সার্থক রূপায়নের চেষ্টা শুরু হলো। বাঁধ নির্মাণে তৎপর হলো সাবাবাসী। বহু লোকের উদয়াস্ত পরিশ্রমে তৈরী হলো একটি সমন্বিত বাঁধ। দু'পর্বতের মাঝখানটায় এটা নির্মিত হলো। বাঁধটি তিন স্তর বিশিষ্ট। এর প্রতি ধাপে ছোট ছোট নির্গম পথ রাখা হয়েছে। এগুলো দিয়ে প্রয়োজনমাফিক পানি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে।

বাঁধের পাশে অনেকগুলো নালা খনন করা হলো। যাতে নালা দিয়ে সারাদেশে পানি পৌঁছানো সম্ভব হয়। নির্গম পথের কপাট খুলে ইচ্ছামত সারা বছর এ ভূখণ্ডের খাল ও নালাসমূহ নাব্য রাখা যাবে।

বাঁধের সাহায্যে পানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সাবাবাসীদের দিন ফিরতে লাগলো। অতিদ্রুত দেশের সর্বত্র লাগলো পরিবর্তনের ছোঁয়া।

বহুদিনের কষ্টের যবনিকাপাত হলো।

সাবা জাতির দুঃখের অশ্রু তাদের চোখ থেকে মুছে গেলো। আনন্দাশ্রু দেখা গেলো সেখানে। দিন দিন সমৃদ্ধ হতে লাগলো সাবা। অচিরেই তা পরিণত হলো ভূস্বর্গে। এই ভূস্বর্গ এখন একজন রমণীর কর্তৃত্বাধীন। একজন সুশিক্ষিতা নারী এ অঞ্চলের রাণীর পদ অধিকার করে আছেন।

সতের

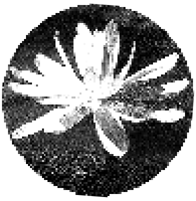

হুদহুদ পাখি হজরত সুলায়মান আ. এর পত্র নিয়ে অতিদ্রুত সাবা পৌঁছলো। পৌঁছেই সে সুযোগ মতো পত্রটি রাণীর কোলে নিক্ষেপ করলো।

রাণী অবাক হলেন। পত্র! এটা আবার কি করে এখানে এলো? আজব ব্যাপার! মানুষজন কিছু নেই। এই নিভৃত পুরীতে কে নিয়ে এলো এ চিঠি? দেখা যাক কি লেখা আছে এতে।

রাণী চিঠিটি পাঠ করলেন। হজরত সুলায়মান আ. প্রেরিত পত্রটি পড়ে সহসা রাণীর মাথায় কোনো বুদ্ধি এলো না। এ বিষয়ে তিনি তার উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করতে চাইলেন। হ্যাঁ, এটাই উত্তম হবে। হুট করে কিছু একটা ভেবে বসা ঠিক হবে না।

মন্ত্রীদেরকে তলব করলেন সাবার রাণী। কাছে ডাকলেন তিনি সবাইকে। তারাও ভেবে পাচ্ছেন না হঠাৎ করে কিই বা ঘটলো। কিছু একটা তো হবে নিশ্চয়। তা না হলে এ অসময়ে ডাক পড়বে কেনো। সাগ্রহে রাণীর দিকে তাকালেন সবাই।

—'আমার কাছে একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ লিপি এসেছে।' উপস্থিত মন্ত্রীদেরকে বললেন রাণী, 'এর মর্ম হচ্ছে এই— আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ যিনি অসীম দয়ালু অতি কৃপাবান। তোমার উচিত আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ না করা এবং আমার প্রতিপক্ষে ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ না করা। আর মুসলমান হয়ে আমার কাছে চলে এসো।

রাণী তার বক্তব্য শেষ করে এ বিষয়ে মন্ত্রীদের মতামত জানতে চাইলেন।

'আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন। আমি তো আপনাদের পরামর্শ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নেই না।' একথা বলে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন তিনি মন্ত্রীপরিষদের দিকে।

'আমাদের সৈন্যবল অস্ত্রবল পর্যাপ্ত রয়েছে।' মন্ত্রীরা জবাব দিলেন রাণীর কথার, 'তাছাড়া আমরা যোদ্ধাজাতি। এমতাবস্থায় আপনি যা বলবেন আমরা তাই করবো। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার তো আপনার রয়েছে। এ বিষয়ে ভেবে দেখুন এবং বলুন আমাদের এখন কি করা উচিত।'

'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমরা যোদ্ধাজাতি। আমাদের শক্তি সম্বন্ধেও আপনার মনে কোনো অস্পষ্টতা নেই।' মন্ত্রীদের কথা শুনে রাণী তার মন্তব্য করলেন, 'প্রতাপ এবং প্রতিপত্তি যথেষ্টই রয়েছে আমাদের। কিন্তু বাদশাহ্‌ সুলায়মান আ. এর ব্যাপারে আমাদেরকে স্থিতধী হতে হবে।'

রাণী থামেন না শুধু বলে যান, 'আমাদের উচিত হবে প্রথমে তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা যাচাই করে দেখা। কেননা আমার কাছে তাঁর যে অলৌকিক পত্রটি এসেছে, তা একথাই বলে যে, তাঁর বিষয়ে বুঝেশুনে অগ্রসর হওয়াই সবদিক থেকে সমীচীন হবে।'

রাণী আরো বলেন, 'আমি চাই কয়েকজন দূত হজরত সুলায়মান আ. এর কাছে পাঠাতে। তারা তাঁর জন্যে উত্তম ও মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে যাবে। এই সুযোগে তারা বাদশাহ্‌র প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের পরিমাপ করে আসতে পারবে। আর তখন এটাও বোঝা যাবে তিনি আমাদের কাছে কী চান। তাঁর উদ্দেশ্য পরিষ্কার বোঝা যাবে তখন। যদি সত্যি সত্যি হজরত সুলায়মান আ. নজীরবিহীন শক্তি ও প্রতাপের অধিকারী হয়ে থাকেন, তো তাঁর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা হবে আত্মহননের নামান্তর।'

সাবার মন্ত্রীরা নিশ্চুপে শ্রবণ করছেন রাণীর যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য। কোনো প্রশ্ন না তুলে তারা শুনে যেতে লাগলেন।

রাণী বলছেন অর্নগল, 'তাছাড়া শক্তিমান নৃপতিদের একটি কঠোর রীতি রয়েছে। তারা যখন বিজয়ীরূপে কোনো রাজ্যে প্রবেশ করেন, তখন সেখানকার লোকালয় ধ্বংস করে দেন। সম্মানিত লোকদেরকে করেন লাঞ্ছিত। অপমানিত। সম্ভ্রান্ত লোক মনে করে তারা কাউকে অপদস্থ করতে ছাড়েন না কাজেই শুধু শুধু ধ্বংস টেনে এনে কী লাভ। সুতরাং প্রথমেই কোনো সংঘর্ষে না গিয়ে লোক পাঠিয়ে দেখা যাক তারা কি সংবাদ বয়ে আনে।' একটানা কথাগুলো বলে থামলেন রাণী।

রাজকোষ থেকে বেছে বেছে উপহার নির্বাচন করা হলো হজরত সুলায়মান আ. এর জন্যে। বাদশাহ্র নিকট সাধারণ জিনিস তো আর পাঠানো যায় না। বিরল ধরনের উপঢৌকন না পাঠালে রাজ্যপ্রধানের মনোতুষ্টি অর্জন করা যায় না। আবার এতে নিজেদের মান মর্যাদায়ও আঘাত আসে।

বাছাইকৃত উপহার সামগ্রী নিয়ে দূতরা ফিলিস্তিনাভিমুখে রওনা হলো।

পথ চলতে চলতে কতো কি ভাবছে দূতগণ। কি আয়োজন আছে বাদশাহ্ সুলায়মান আ. এর ওখানে কে জানে। লাল গালিচা সম্বর্ধনাও জুটতে পারে ভাগ্যে। আবার নিখাদ তিরস্কার হলেও হতে পারে। মূল্যবান উপহার দেখে সম্রাট যদি খুশী হন– তাহলে পথশ্রান্তি ভোলার অবকাশ পাওয়া যাবে। চাইকি গদি মোড়া বিছানা, উপাদেয় খাদ্য সবই পাওয়া যাবে। নইলে বৃথা এ শ্রম। বৃথা এই পথ চলা।

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে দূতরা ফিলিস্তিন পৌঁছলো।

উপস্থিত করা হলো তাদেরকে হজরত সুলায়মান আ. এর সামনে। মেলে ধরলো দূতরা নবীর সম্মুখে রাণীর পাঠানো উপঢৌকন। এগুলো দেখে বাদশাহ্ সুলায়মান আ. তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। অসন্তুষ্ট হয়েছেন তিনি রাণীর কাণ্ডকারখানা দেখে। দূতদেরকে নবী পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিলেন তাঁর অনাগ্রহের কথা। বললেন, 'তোমরা আমার পত্রের মর্ম উদ্ধারে ভুল করেছো। তোমরা চাও এগুলো গ্রহণ করে আমি ধন্য হই। অথচ তোমরা দেখতেই পাচ্ছো আল্লাহ্তায়ালা আমাকে যা দান করেছেন তা যথেষ্ট। এ দানের তুলনায় তোমাদের বহন করে আনা উপহার যে কত নগণ্য তাও বুঝতে তোমাদের বাকী থাকার কথা নয়। আর জেনে রাখো, আমি এসবের প্রত্যাশীও নই।'

হজরত সুলায়মান আ. আদেশের সুরে বললেন, 'তোমরা তোমাদের উপঢৌকনসহ নিজ রাজ্যে ফিরে যাও। রাণীকে গিয়ে বলো, আমার নির্দেশ অমান্য করলে তোমাদের রাজ্য আক্রান্ত হবে। এমন এক সেনাবহর নিয়ে আসবো আমি, সেই বাহিনীর মোকাবেলা করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এরপর আমি তোমাদের অপদস্থ করে দেশ থেকে বিতাড়িত করবো।'

নবীর কথা সমাপ্ত হতেই বিষম খেলো দূতরা। কি সাংঘাতিক কথা। মারাত্মক ভয়ের কথা। তাদের দেহে কাঁপুনি ধরে গেলো।

এমনিতেই দূতগণ ফিলিস্তিনের পথঘাট, মহামূল্যবান পাথরখচিত ভবন ইত্যাদি দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছে। তারপর দরবারে ঢুকে হয়েছে স্তম্ভিত। কাজেই হজরত সুলায়মান আ. এর দৃঢ়চেতা কথাবার্তা তাদের রক্ত হিম করে ফেললো।

দেহ তাদের নিশ্চল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে কি হবে অন্তর হয়ে উঠলো অস্থির। কতক্ষণে নবীর দরবার থেকে কেটে পড়া যায় সে চিন্তাই তাদের প্রধান হয়ে দাঁড়ালো। কোনোরকমে শরীর টেনে নিয়ে বের হয়ে পড়লো সাবা রাজ্যের প্রতিনিধিরা।

উহ বাঁচা গেলো! পৈতৃক দেহটা যে টিকে আছে এখনো। মুণ্ডুটা ধড় থেকে আলাদা করে দিলেই বা কি হতো। নাহ। আর ভাবা যায় না।

আঠার

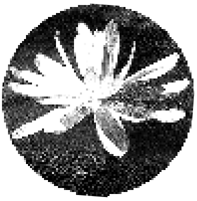

বিফল মনোরথ হয়ে দূতরা সাবায় ফিরে এলো।

এদিকে রাণী উদগ্রীব হয়ে আছেন তাদের প্রতীক্ষায়। আগমন সংবাদ পেয়েই রাণী চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ডেকে পাঠালেন তাদেরকে। প্রশ্নের দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন তাদের দিকে। বিব্রত দূতরা ইতস্তত করতে লাগলো। অভয় দিলেন রাণী, ‘কোনো ভয় নেই। নির্ভয়ে বলো।’

দূতরা তাদের বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কথা দেশনেত্রীর কাছে সবিনয়ে নিবেদন করে বললো, ‘আর বলবেন না। বিচিত্র এক দেশ দেখার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য হয়েছে আমাদের। আশ্চর্য ব্যাপার! সব এলাহি কাণ্ড কারখানা। যেমন বাদশাহ্ হজরত সুলায়মান আ.। তাঁকে বোঝা আমাদের সাধ্যের অতীত। তবে হ্যাঁ, এটুকু বলা যায়। শুধু মানুষ নয়, ভয়াবহ জ্বিন, পশুপাখি সবই তাঁর আজ্ঞাবহ। এরা সবসময় সম্মিলিতভাবে বাদশাহ্র নির্দেশ পালনের জন্যে অপেক্ষা করে। এমন ক্ষমতাধর সম্রাটের বিরুদ্ধে আমরা কেনো, পৃথিবীর কোনো শক্তিই দাঁড়াতে পারবে না। আর যে উপহার আমরা নিয়ে গিয়েছিলাম, তা ছিলো আমাদের জন্যে নিতান্তই লজ্জাজনক ব্যাপার। তাঁর ঐশ্বর্যের মোকাবেলায় সে উপহার উপেক্ষা করার মতোই।’

আরো জানায় ফিলিস্তিনফেরত দূতরা, 'বাদশাহ্ সুলায়মান আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, তাঁর কথামতো কাজ না করলে তিনি আমাদের রাজ্য আক্রমণ করবেন। তাতে তো আমাদেরকে পরাজিত করবেনই, আবার দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবেন বলেও হুমকি দিয়েছেন।' পথশ্রান্ত দূতগণ তাদের কথা শেষ করলো।

কদিন থেকে কি যে হয়েছে। এতোদিনের আরাম আয়েশ সব শিকায় উঠেছে। ভাবনার কথা। ভয়ানক চিন্তার কথা। এ রকম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের পরিকল্পনা তো কোনো অর্বাচীনও করবে না। কিন্তু রাণী এখন এসব ভাবছেন না। তিনি ভাবছেন অন্য কথা।

অপর একটি সম্ভাবনার দ্বার খোলা দেখতে পাচ্ছেন তিনি মানস চক্ষে। এ লোকের আনুগত্য স্বীকার করতেই হবে। কোনো গত্যন্তর নেই। বিলম্ব করলে সমূহ ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কীভাবে। কীভাবে অনুগত হলে পরে সাবা রাজ্য নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

রাণী হজরত সুলায়মান আ. এর পত্রটি নিয়ে আবারো বোঝার চেষ্টা করলেন। কি বলতে চেয়েছেন বাদশাহ্। এতে মুসলমান হওয়ার কথা লেখা আছে। আর এর পারিভাষিক অর্থ তো আত্মসমর্পণ করা। হ্যাঁ, তাইতো। এ মর্মই বোঝা যায় পত্র থেকে। নাকি অন্য কিছু। নাহ্। আর কিছুই মাথায় আসছে না....।

অনেক চেষ্টাচরিত্র করেও মুসলমান শব্দের ভিন্ন অর্থ বের করা সম্ভব হলো না রাণীর পক্ষে। এটা যে সত্য ধর্ম গ্রহণ করার আহ্বান সেটা হৃদয়ঙ্গম করা তার জন্যে আপাতত অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো।

দীর্ঘদিনের কুফুরীচর্চার প্রভাব তাকে সত্য উপলব্ধিতে বাধাগ্রস্ত করলো। একজন নবী যে রাজকীয় আনুগত্য শুধু নয় ধর্মীয় আনুগত্য চাইবেন– এ সাধারণ কথাটির গভীরে রাণীকে পৌঁছতে দিলো না। স্বভাবতই তিনি ভেবে নিলেন যে, হজরত সুলায়মান আ. এর সুবিশাল প্রভাবপ্রতিপত্তির কাছে নতি স্বীকার করলেই নবী সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এর ফলে তিনি নিজে ও তার দেশবাসী অযাচিত দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পাবেন।

ভাবনা শেষে রাণী সিদ্ধান্ত নিলেন।

সভাসদদের সাথে পরামর্শ করে তিনি ঠিক করলেন নিজেই ফিলিস্তিন যাবেন। সেখানে গিয়ে হজরত সুলায়মান আ. এর সঙ্গে দেখা করে তাঁর আজ্ঞাবহ বলে নিজেকে ঘোষণা করবেন।

রওনা হলেন সাবার রাণী।

গন্তব্য তার হজরত সুলায়মান আ. এর শাহীমহল।

ঊনিশ

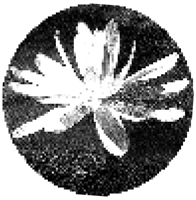

হজরত সুলায়মান আ. অবগত হলেন রাণীর ফিলিস্তিন আগমন সম্পর্কে। জেনেছেন যে, রাণী এখন পথে। এখানে পৌঁছতে বেশ কিছুটা সময় তার লাগবে। এ সময় একটি কাজ করা যায়।

যেহেতু সাবা সম্প্রদায় সূর্য পূজায় লিপ্ত। সূর্যের আরাধনা করাই তাদের মূল কাজ। তারা বিশ্বাস করে মঙ্গলামঙ্গল সাধন করার সব ক্ষমতা নক্ষত্রমণ্ডলীর। আর নক্ষত্রগুলোর মধ্যে সূর্যকেই সবচেয়ে বড় দেখা যায়। কাজেই এটা সর্বাপেক্ষা পূজনীয় ভাগ্যবিধাতা। এতো বিশাল তেজময় ভাগ্যবিয়ন্তা ছাড়া আর কে আরাধ্য হতে পারে। হৃদয়ের অর্ঘ আর কাকে দেয়া যায়।

তাই নবী তাদের এ ভ্রান্ত মতবাদে আঘাত হানবেন বলে স্থির করলেন। এজন্যে তিনি একটি পন্থা অবলম্বনের প্রয়াস পেলেন। যাতে সাবার রাণী আপনাআপনি টের পায় নিজেদের বিশ্বাসের অসারতা। বুঝে যায়, সূর্য পূজা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্টতা।

হজরত সুলায়মান আ. ভাবলেন– রাণী এখানে এসে পড়বার আগেই যদি তার সিংহাসনটি সাবা থেকে এনে ফেলা যায়, তাহলে রাণীর অলীক প্রত্যয়ে দোলা লাগতে পারে। তার আজন্মের ধারণা ভেঙে যেতে পারে।

নবী সভাকক্ষে ঘোষণা করলেন, 'হে সভাসদবৃন্দ তোমাদের মধ্যে কি কেউ এমন আছো যে, রাণী অনুগত হয়ে এখানে চলে আসার পূর্বেই তার সিংহাসনটি উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারবে।'

'আমি সেটি আপনার এ দরবার ভঙ্গ হওয়ার আগেই এনে দিতে পারি।' উপবিষ্ট দরবারীদের মধ্য থেকে জনৈক বিশালাকৃতির জ্বিন আবেদন করলো, 'আমার এ রকম ক্ষমতাও রয়েছে। আর আমি এ বিষয়ে বিশ্বস্ত।'

অপর এক ব্যক্তি। যিনি মানব সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি বললেন, 'আমি আপনার চোখের পলক পড়ার চেয়ে কম সময়ে সিংহাসনটি সামনে হাজির করতে পারি'।

একথা যে ব্যক্তি বললেন, তিনি হজরত সুলায়মান আ. এর বিশিষ্ট সাহাবী। নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গী তাঁকে বলা যেতে পারে। হজরত সুলায়মান আ. এর পবিত্র সংসর্গের ফলে এ ব্যক্তি তওরাত ও যবুরের উচ্চ পাঠক্রম সমাপ্ত করেছেন। অবহিত

হয়েছেন তিনি আল্লাহ্পাকের গুণাবলী সম্বন্ধীয় রহস্য ও তথ্যাবলী সম্পর্কে। অধিকারী হয়েছেন নবুয়তের প্রতিবিম্বজাত যোগ্যতার।

যদিও বিরাটাকৃতির জ্বিনটি সিংহাসন আনার কাজটি যথাসময়ে সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবু হজরত সুলায়মান আ. চাইলেন কাজটি মানব শ্রেণীভুক্ত বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারাই নিষ্পন্ন হোক।

জ্বিন জাতি যত শক্তিধারী হোক না কেনো নবুয়তের মর্যাদা তারা লাভ করেনি বলে বিশিষ্ট মানুষের তুলনায় তারা কোনো ক্ষমতাই রাখে না।

এদিকে সাহাবীটি আশাধারী হয়ে আছেন। হজরত সুলায়মান আ. এর আত্মিক লক্ষ্যের মাধ্যমে কাজটি তিনি করতে পারবেন বলে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি রয়েছে।

মুখ ফিরিয়ে হজরত সুলায়মান আ. সিংহাসনটি দেখতে পেলেন। সাবার শাসনকর্ত্রীর সিংহাসন। হুদহুদ পাখি তবে এটার কথাই বলেছিলো। মন্দ নয় দেখতে সিংহাসনটি। বেশ কারুকাজ করা। নবুয়তের বারিধারায় স্নাত লোকটি তাঁর কথা অনুযায়ী রাণীর আসন উঠিয়ে এনেছেন। তা দেখে অভিভূত নবী আল্লাহ্তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন, ‘এটা আল্লাহ্পাকের উচ্চ অনুগ্রহ। যেনো আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞ হই না অবাধ্য হই।’

সিংহাসন উঠিয়ে আনার কাজটি যদিও আপাতদৃষ্টিতে হজরত সুলায়মান আ. এর সাহাবীর কৃতিত্ব বলে মনে হয়। তবু নবীর উপস্থিতিতে এটাকে তাঁরই মোজেজা হিসেবে গণ্য করতে হবে। আর মোজেজা যেহেতু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্পাকই প্রকাশ করেন নবীর মাধ্যমে। তাই নবী একে পরম প্রভুর অন্যতম অনুগ্রহ বলেই বিবেচনা করেছেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভেতর দিয়ে।

নবী সাবার রাণীর সাধারণ জ্ঞানের পরিধি পরখ করার জন্যে বললেন, ‘এ সিংহাসনটির আকৃতি কিছুটা বদলে দাও। তারপর ঐ মহিলার সামনে প্রদর্শন করো। দেখি সে এটাকে নিজের বলে সনাক্ত করতে পারে কিনা। নাকি সে ঐ ধরনের ব্যক্তিদের একজন যাদের চেনার সামর্থ্য নেই।

সফর অন্তে সাবার রাণী হজরত সুলায়মান আ. এর রাজভবনে প্রবেশ করলেন। তাকে দরবার কক্ষে উপস্থিত করা হলো। কক্ষটি দেখে রাণীর চক্ষু চড়ক গাছ। দূতরা তাহলে ঠিকই বলেছিলো। না। তারা ঠিকভাবে এ রাজ্যের বর্ণনা দিতে পারেনি। আর কারো পক্ষে সঠিক বিবরণ দেয়া সম্ভবপরও নয়। এ রাজ্য চোখে না দেখলে কেউ কানে শুনে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারবে না।

পুরো দরবার ঘুরে রাণীর দৃষ্টি সেই সিংহাসনটির উপর গিয়ে স্থির হলো। একি! এটা কোত্থেকে এখানে এলো? এ যে দেখা যায় তারটির অনুরূপ। অনেক মাথা খাটিয়েও রাণী শেষ পর্যন্ত আসল ব্যাপার আঁচ করতে পারলেন না।

‘তোমার সিংহাসনটি এরকমই কি? হজরত সুলায়মান আ. এর কথায় রাণী সম্বিত ফিরে পান। বিস্ময় গোপন করে তিনি উত্তর দেন, ‘মনে হয় এটা সেটাই।’

সিংহাসনটির গঠন দেখে মোটামুটি বোঝা যায় এটা তারই। কিন্তু আকৃতির সামান্য রদবদল রাণীর অন্তরে কিছুটা সন্দেহ এনে দেয়। তাই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব হলো না এটা আমারটাই।

‘মহাত্মন। আপনার অপরিমেয় শক্তিমত্তার কথা আমি আগেই জেনেছি।’ বিস্ময়াহত রাণী বললেন, ‘তার উপর সিংহাসন সংক্রান্ত আজব ঘটনা তো চোখের সামনেই রয়েছে। এটাতো আপনার ক্ষমতার সত্যায়ন করে অধিক পরিমাণে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এ অলৌকিক কর্মটি আনুগত্য প্রকাশের জন্যে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধকারী। আগের মতোই আমি এখনো আপনার পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করছি।’

পূর্বের ধারণাই এখনো তার প্রবল রয়েছে। কথাগুলো বলে রাণী ভাবলেন, বাদশাহ্ এটাই চেয়েছেন। তাঁর অধীনস্থ বলে নিজেকে প্রকাশ করাই যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু নবী যে সমর্পণ কামনা করেন তা যে এরকম আনুগত্য ঘোষণার মাধ্যমে হয় না– সেটা রাণীর মনে ঠাঁই পেলো না। কোনো নবী কাউকে শুধু রাজকীয় অধীনতা প্রকাশের আহ্বান জানান না– তা ধর্মবিমুখ, সূর্য পূজারী রমণীর জ্ঞানবহির্ভূত রইলো।

বাদশাহ্র আধিপত্য মেনে নিয়ে কার্যোদ্ধার হয়েছে বলে রাণী মনে করলেন। ভাবলেন, ব্যাস। আর কোনো অসুবিধার কারণ নেই। নিশ্চিত শংকামুক্ত হওয়া গেলো।

বিশ

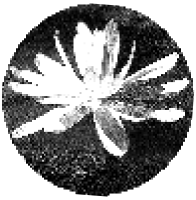

বিস্ময়ের তখনো ঢের বাকী ছিলো।

সাবা নেত্রীর স্বপ্নের অগোচর অনেক কিছুই রয়েছে ঘটবার অপেক্ষায়। ফিলিস্তিন আসার পর থেকে তার একদণ্ড যেনো বিশ্রাম নেই। নতুন নতুন চমক দেখে দেখে হয়রান হয়ে পড়ছেন কেবল।

ইতোমধ্যে হজরত সুলায়মান আ. রাণীর জড়চেতনায় আঘাত দেওয়ার জন্যে ব্যবস্থাপত্র করে রেখেছেন। আশা করছেন তিনি, এ অমোঘ অষুধ তার রোগ সারিয়ে তুলবে।

রোগ নয় তো কি। আল্লাহ্‌পাকের দেয়া শরীয়ত যদি কারো মনে না ধরে। নবীর সৎপথে আহ্বান যদি কারো দৃষ্টিতে স্পষ্ট না হয়, তো এটাকে কি বলা যায়। রোগাক্রান্ত হলে মানুষের রসনায় মিষ্ট বস্তুও তিক্ত বলে মনে হয়। তেমনি অসুস্থ অন্তরও ইমান ও হেদায়েতের স্বাদ গ্রহণ করতে অসমর্থ।

ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী হজরত সুলায়মান আ. জ্বিনদেরকে দিয়ে বিরাট এক শীশমহল তৈরী করিয়েছেন। বিশালায়তনের এ মহলটি প্রাসাদ অঙ্গনের বিস্তর জায়গা দখল করে আছে।

এমনই এর নির্মাণ সৌকর্য। যা যে কোনো মানুষের বাক্যস্ফূরণ রহিত করে দিতে পারে। বর্ণনাতীত ভাস্কর্য যেনো সগর্বে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। কাঁচের বহুল ব্যবহার মহলটিকে করেছে অনন্যসাধারণ। মসৃণ গা ঠিকরে আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। সে আলোয় দর্শকের চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

অভিনব কারুকলার আধিক্য এ শীশমহলকে স্থাপত্য জগতে বিশেষ মর্যাদায় করেছে আসীন। এর উচ্চতা তো আরেক বিস্ময়। উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গের কথা মনে হয় এর আকাশচুম্বী অবস্থান দেখে।

শীশমহলের একটি বিলাসবহুল কামরা রাণীর বিশ্রামের জন্যে রাখা হয়েছে। এখানেই রাণী আরাম করবেন বলে হজরত সুলায়মান আ. ঠিক করেছেন।

মূলভবনে প্রবেশের আগে সম্মুখভাগে নির্মিত একটি সরোবর পাড়ি দিতে হয়। অনেকখানি জমি নিয়ে বিস্তৃত এটি। বিশুদ্ধ পানিতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। দেখে মনে হয় এখনি পানি উপচে পড়বে।

সরোবরের উপরিভাগ স্বচ্ছ কাঁচে এমনভাবে আবৃত করে দেয়া হয়েছে যে, এটাকে শুধু পানিপূর্ণ বলেই মনে হয়। দূর থেকে কেবল নয়, কাছে গেলেও বোঝার উপায় নেই– এমনই এর নির্মাণ কৌশল। আবরক কাঁচের উপস্থিতি যেনো বেমালুম উবে গেছে।

আলাপ শেষে রাণী ক্লান্তি অনুভব করলেন। সাবা থেকে ফিলিস্তিন। অনেকটা পথ তাকে পাড়ি দিতে হয়েছে। তারপর এখানে এসে ব্যাপার স্যাপার দেখে তিনি অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। সাবার রাণী এখন সত্যিই ক্লান্ত। তার বিশ্রামের বড়ই প্রয়োজন।

অনুধাবন করতে বেগ পেতে হয়নি হজরত সুলায়মান আ. এর যে, রাণী পরিশ্রান্ত। আমন্ত্রণ জানালেন তাকে বিশ্রামের জন্যে। দিক নির্দেশ করলেন নবী শীশ মহলের। রাণী অনুগামী হলেন তাঁর।

এগিয়ে চলেছেন তাঁরা মহলের দিকে। সলজ্জ ভঙ্গিতে ছোট ছোট পদক্ষেপে হেঁটে চলেছেন রাণী নবীর পেছনে পেছনে।

দূর থেকে শীশ মহলের উপর রাণীর চোখ পড়লো। দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো তার সাথে সাথেই। চুম্বক যেমন লৌহজাত দ্রব্য টেনে নেয়। তেমনি এ প্রাসাদ রাণীর দৃষ্টি অপহরণ করলো।

কি ওটা? স্বপ্নপুরী নয়তো। হজরত সুলায়মান আ. যা দেখাচ্ছেন, তা তো স্বপ্নেও কোনো মানুষ দেখে না। চলতে গিয়ে রাণীর পা যেনো অসাড় হয়ে আসতে চায়। পা গুলো যেনো তার নিয়ন্ত্রণে নেই আর।

শীশ মহলের কাছে পৌঁছে রাণী হলেন ভাষাহীন। নির্বাক। কোনোরকম মন্তব্য প্রকাশের জন্যে দুচারটে শব্দও তার অভিধানে নেই বলে মনে হচ্ছে।

আচ্ছা। এমন সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রাসাদ কোনো মানুষ গড়তে পারে? নাকি পারে কোনো সৃষ্ট জীব গড়তে। আলো চমকানো প্রাসাদ এমনিতেই রাণীর দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানোর জন্যে যথেষ্ট ছিলো। তার উপর কাকচক্ষু পানিভর্তি সরোবর।

রাণীর মাথাটা যেনো ঘুরে উঠলো। চোখে যেনো সর্ষে ফুল দেখছেন তিনি। এ অবস্থায় কাঁচ ঢাকা জলাধার তার কাছে নিছক পানি বলে ভ্রম হলো।

প্রাসাদের ভিতরে যেতে হলে পানিটুকু অতিক্রম না করে সেখানে যাওয়ার বিকল্প নেই। কি আর করা— একটু পা ভিজিয়েই যেতে হবে। এই ভেবে রাণী তার পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গোছার উপর টেনে ধরলেন। তা দেখে হজরত সুলায়মান আ. এতোক্ষণের নীরবতা ভাঙ্গলেন।

'এটাতো কাঁচের তৈরী শীশ মহলের অঙ্গন।' প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন নবী। তাঁর বচনে কোনো ভর্ৎষনা নেই। নেই কোনো শ্লেষ। শাদামাটা কথাই নবীরা বলেন। তাদের কথায় কোনো জটিলতা থাকে না।

হজরত সুলায়ামান আ. এর সরল বাক্যটি বিস্ফোরণ ঘটালো রাণীর মনে। মগজে। যেনো অনেক দিনের মরচে পড়া পদার্থে হাতুড়ির সজোর আঘাত লেগেছে। নবীর সঞ্জীবনী শব্দমালার দুর্বার আঘাতে কেঁপে উঠলো অবিশ্বাস। খুলে গেলো বন্ধ জানালা, অন্তরের। চোখে এসে বসলো হঠাৎ আলোর ঝলকানি।

সত্যিই তো। ভাবলেন রাণী আনমনে। এতোদিন কি করছিলাম। কিসের মোহে অন্ধকারে বাস করছিলাম। ওহ। কি ভ্রান্তি। সৃষ্টবস্তু সূর্যকে সর্বশক্তিমান ভাগ্যবিধাতা মেনে নিয়ে কি অন্যায়ই না করেছি।

রাণীর ভাবনা আরো প্রসারিত হয়।

বাদশাহ্ সুলায়মান আ. যে অভাবিত ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন— এতো নিছক কোনো দুনিয়াদার বাদশাহ্র প্রতিপত্তি দেখানোর মতো নয়। এতো সে কথাই বলে যে, তিনি যা কিছু এ যাবত অবলোকন করিয়েছেন— তা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের

জন্যে নয়। এ সমস্ত কিছু তিনি যাঁর কাছ থেকে লাভ করেছেন– সেই আদিঅন্তহীন জাত পাকেরই মহিমা সমুন্নত করেছেন। যিনি নক্ষত্র জগতের একচ্ছত্র অধিপতি। সমগ্র বিশ্ব জগতের মহামহিম প্রতিপালক। তাঁরই প্রশংসা কেবল হজরত সুলায়মান আ. জ্ঞাপন করেছেন।

অনুশোচনায় বিগলিত সাবার রাণী আহত স্বরে বলে উঠলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার প্রদর্শিত পথ থেকে দূরে সরে নিজের প্রতি অন্যায় করেছি। আমি হজরত সুলায়মান আ. এর দলভুক্ত বলে নিজেকে ঘোষণা করলাম এবং ইমান আনলাম বিশ্বগজতের প্রতিপালক আল্লাহ্তায়ালার প্রতি।'

একুশ

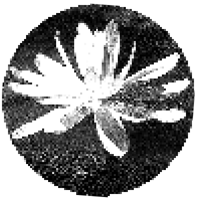

সন্ধ্যা নিকটবর্তী।

যুদ্ধের ময়দানে রয়েছেন হজরত সুলায়মান আ.।

হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো যুদ্ধাশ্বগুলোর কথা। বাহন হিসেবে আনা ঘোড়াগুলো তো দেখা হয়নি এ পর্যন্ত। প্রাণীগুলো দেখতে চাইলেন নবী। কেমন এগুলো। দেখতে সুশ্রী তো। যুদ্ধকালীন উপযোগীতাই বা এগুলোর কেমন। দেখা যাক।

আদেশ করলেন নবী ঘোড়াসমূহ নিয়ে আসার জন্যে। নির্দেশ পেয়ে অনুগত সৈনিকেরা আস্তাবলের দিকে ছুটলো। তারপর নিয়ে এলো সেগুলো হজরত সুলায়মান আ. এর সামনে। অশ্বগুলো দেখে খুশী হন তিনি। চমৎকার। খুব ভালো। এগুলো সত্যি দেখার মতো বটে। এরকম উত্তম বংশজাত সুদর্শন, দ্রুতগামী ঘোড়াই তো চাই। এ ধরনের প্রশিক্ষিত ঘোড়াই তাঁর প্রয়োজন।

অশ্ব সম্পর্কে হজরত সুলায়মান আ. এর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রয়েছে। ঘোড়াসমূহ দেখে তাঁর বুঝতে বিলম্ব হয়নি যে, এগুলো সদ্বংশজাত। এগুলো যে বেশ গুণী তা তিনি প্রথম দর্শনেই সমঝে গেছেন। এ প্রাণীরা যুদ্ধ সরঞ্জাম হিসেবে খুব ভালো ফল দেবে এ কথাও বলে দেয়া যায়।

হজরত সুলায়মান আ. স্বগতোক্তির মতো বলে ফেললেন, 'এ অশ্বগুলোর সাথে আমার ভালোবাসা এমন ধনৈশ্বর্যের মতো যা আল্লাহ্পাকের স্বরণেরই অঙ্গীভূত।

এ কথা বলার ফাঁকেই ঘোড়াগুলো আস্তাবলের দিকে চলতে শুরু করলো। নবী দেখলেন অশ্বগুলো দ্রুত দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলো। পুনরায় তিনি আদেশ দিলেন সেগুলো ফিরিয়ে আনার জন্যে।

ফিরিয়ে আনা হলো সেগুলোকে।

প্রাণীগুলো হাতের কাছে পেয়ে নবী আদর করতে শুরু করলেন। তাদের পায়ের গোছা ও ঘাড়সমূহে হাত বুলাতে লাগলেন। একজন বিশেষজ্ঞ যেমন করেন। তেমনি তাদের প্রতি নবী স্নেহবর্ষণ করতে থাকেন। আর ঘোড়াগুলোও যেনো আবেশভরে আদর নিয়ে চলেছে। যেনো এতোদিনে তারা একান্ত শুভ্যার্থীকে কাছে পেয়েছে।

নবীগণ শুধু মানুষের শুভাকাঙ্খি হন তা নয়। সামান্য প্রাণীও তাদের শুভকামনার বাইরে নয়।

বাইশ

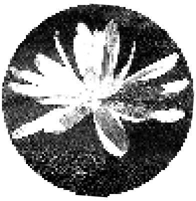

পিতার মতো নির্জনবাসের অভ্যাস হজরত সুলায়মান আ. এরও রয়েছে। তবে পিতার সাথে তাঁর নির্জনতা অবলম্বনে কিছুটা পার্থক্য আছে। তিনি হজরত দাউদ আ. মতো সময় নির্দিষ্ট করে নেন না। মাঝে মাঝে লোক সংসর্গ ত্যাগ করেন।

রাজকার্যে ও নবুওয়তের আঞ্জাম দেয়ার কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকার পরেও কিছু অবকাশ নিয়ে একা একা সময় অতিবাহিত করেন তিনি। ইবাদত বন্দেগীর সুবিধার্থে নিভৃত কক্ষে চলে যান। লাগাতার বেশ কিছুদিন কাটিয়ে দেন জনহীন আবাসে। এ সময় নিজ পরিবারের লোকজন কিংবা প্রজাসাধারণের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত তাঁর হয়ে ওঠে না। এভাবে প্রতিপালকের করুণা বারিতে সিক্ত হন নবী অনেকদিন।

হজরত সুলায়মান আ. এর নিঃসঙ্গ সাধনার কথা নবী পরিবারের সবাই ভালো করেই জানেন। আর রাজকর্মচারীদেরও এ সংবাদ অজানা নেই। বরাবর দেখে আসছেন তারা নবীকে এরকম করতে।

ভুলেও কেউ তাঁকে বিরক্ত করেন না। দরকার পড়লেও নবীর নির্জনবাসের সময় কেউ কাছে যান না। কোনো খবরাখবর থাকলে অপেক্ষা করেন দিনের পর

দিন। তবু তারা হজরত সুলায়মান আ. এর ধ্যান ভাঙতে রাজী নন। তাঁর ইবাদতের একাগ্রতা নষ্ট করার পক্ষপাতি নন কেউ।

রাজ দরবারে তাঁর অবর্তমানে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। শাহী মহল থেকে নিয়ে দেশের সর্বস্তরে কাজ চলে একই তালে। কোথাও কোনো অসুবিধা পরিদৃষ্ট হয় না। কেমন যেনো অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় চলে সব কিছু।

এটা সম্ভব হয় সকলের উপর নবীর ব্যাপক প্রভাবে। জনমনে সাংঘাতিক প্রভাব নবীর। প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁর অনুপস্থিতি উপস্থিতির চাইতে কম কিছু নয়। রাজ্যময় অনুসন্ধান করলেও আগের তুলনায় বিসদৃশ্য কিছু নজরে আসেনা। বরং দেখা যায় যাকে তিনি যে কাজ নির্ধারণ করে দিয়েছেন সে কাজ ওই ব্যক্তি ঠিক ঠিক ভাবে করে চলেছে।

হজরত সুলায়মান আ. মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেলেন যেনো। ক্রমেই এগিয়ে আসছে যেনো অন্তিম মুহূর্ত। খুব একটা সময় হাতে নেই। বুঝতে পারলেন নবী।

পিতা হজরত দাউদ আ. বিদায় নিয়েছেন সেই কবে। অনেক দিন পেরিয়ে গেছে তারপর। ভূমধ্য সাগরে উত্থাল পাথাল হয়েছে কতো পানি তার কোনো লেখাজোখা নেই। পিতার প্রবর্তিত শরীয়তের ভার হজরত সুলায়মান আ. এর দায়িত্বে আসার পর থেকে তিনি তো একদণ্ড ফুরসত পাননি নিজের জন্য।

উম্মতের চিন্তা তাঁকে সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। মানুষকে সরল পথে ডাকার পাশাপাশি রাজ্য শাসনের মতো জটিল কাজও করতে হয়েছে। কিন্তু এসবের তো ইতি আছে। আছে সমাপ্তি।

একটি ভাবনা নবীকে অন্তিম যাত্রার প্রাক্কালে ভাবিয়ে তুললো। কতো কাজ অসমাপ্ত রয়ে গিয়েছে। কতো পরিকল্পনা করে নগর-দেশ পুনর্গঠনের জোয়ার চলছে। এ অবস্থায় যদি ডাক আসে প্রতিপালকের তরফ থেকে-তাহলে বাধ্য জ্বিন সম্প্রদায় তো হাত গুটিয়ে ফেলবে। কাজ অসমাপ্ত রেখে সবগুলো অসম্পূর্ণ কাজ ছেড়ে তারা চলে যাবে।

লোকজন থেকে দূরে থাকা বিষয়টিকে হজরত সুলায়মান আ. মৃত্যুত্তোর কাজে লাগাবেন বলে ঠিক করলেন। হ্যাঁ। এভাবে কাজ হবে। নির্জনবাস নিয়ে কারো মনে কোনো কৌতূহল জাগবে না। এভাবে তিনি অনন্ত লোকে যাত্রা করলেও কেউ টের পাবে না।

নগর নির্মাণরত জ্বিনদেরকে নবী প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দিলেন। খুঁটি নাটি সবকিছুই বুঝিয়ে দিলেন। সভাসদদেরকে ডেকে দরকারী কথাগুলো বলে দিলেন শেষবারের মতো।

তারপর নবী নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে চলে এলেন।

তেইশ

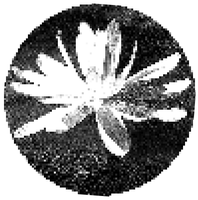

হজরত সুলায়মান আ. নির্জন ঘরে এসে একটি লাঠিতে ভর দিয়ে ইবাদতে লিপ্ত হলেন। মহান প্রতিপালকের বন্দেগীতে পুরোপুরি নিমগ্ন হলেন নবী। প্রহরের পর প্রহর গড়িয়ে যাচ্ছে। সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। পার্থিব কোনোকিছুর দিকেই লক্ষ্য নেই।

দিন রাত পেরিয়ে যাচ্ছে জাগতিক নিয়মে।

হজরত সুলায়মান আ. যেনো সময়ের উজান পাড়ি দিচ্ছেন।

অপেক্ষা করছেন তিনি। প্রিয়প্রভুর আমন্ত্রণের অপেক্ষা। কখন আসবে প্রভু প্রতিপালকের ডাক। প্রেমময় প্রেমাস্পদের ডাক।

নশ্বর এ ভুবন পাড়ি না দিলে তো প্রিয়জনের সান্নিধ্য লাভ করা যাবে না। মধ্যবর্তী জগতে পা না রাখলে চিরমিলনের দ্বার কীভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে। এখানে– এই মাটির বুকে থেকেতো কষ্ট একটাই। প্রিয়তমের বিরহই এখানকার একমাত্র দুঃখ।

লাঠিতে ভর করে আছেন বিরহী নবী। নিষ্ঠাবান প্রেমিক যেমন তার প্রেমাস্পদের প্রতীক্ষায় থাকে। বরং তার চেয়েও বেশী।

নবীর পবিত্র রূহ কবজ করলেন হজরত আজরাইল আ.। সেই সাথে সমাপ্ত হলো হজরত সুলায়মান আ. এর পার্থিব জীবনযাপন। ইতি ঘটলো তাঁর প্রভু মিলনের প্রতীক্ষার।

স্থির হয়ে রইলো তারপরও নবীর দেহ। লাঠির প্রভাবে তাঁর দেহ থাকলো অনড়। দেখলে বোঝা যায় না, তিনি আর এ জগতে নেই। এভাবেই রইলেন তিনি। কেটে গেলো এরি মধ্যে বেশ কিছু দিন। নবীর নিস্পন্দ দেহ তবু রইলো অবিকৃত। যেনো জীবিত ব্যক্তি একাগ্র সাধনায় নিয়োজিত রয়েছেন।

মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের শরীরে পচন ধরে। সে পচনক্রিয়া মানবদেহকে করে বিকৃত। কয়েক দিনের মধ্যেই পচে গলে একাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ অবস্থা নবীদের কখনোই হয় না। তাঁদের পবিত্র দেহে পচনক্রিয়া সংঘটিত হয় না। চিরকালের জন্য তাদের শরীর থাকে অপরিবর্তিত। পরিবর্তনের সামান্যতম ছোঁয়াও সেখানে থাকে অনুপস্থিত। তাদের দেহ মাটির জন্যে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

এদিকে কর্মরত জ্বিনরা ব্যস্ত।

নিবিষ্ট মনে তারা হজরত সুলায়মান আ. এর আদেশকৃত কাজ করে চলেছে। জানা নেই তাদের এরি মাঝে নবী পরলোকে যাত্রা করেছেন। জ্বিনরা তাঁকে জীবিত ভেবে কাজ করতে থাকে এক নাগাড়ে।

প্রচণ্ড খাটাখাটনি করে জ্বিন সম্প্রদায় তাদের নির্মাণাধীন কাজ শেষ করলো। নিজেদের কাজ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করলো তারা। যাক এতোদিনে কাজ সমাপ্ত হলো। এবার হজরত সুলায়মান আ. এর খোঁজ নেয়া দরকার। তাঁকে এ সংবাদ দিতে হবে।

হজরত সুলায়মান আ. এর ভারসাম্য রক্ষাকারী লাঠিতে ঘুণপোকা ধরলো। ধীরে ধীরে পোকাগুলো লাঠির দৃঢ়তা হ্রাস করতে লাগলো। ফলে এটা ক্রমাগত ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে। জরাজীর্ণ লাঠিটি এক সময় শেষ অবস্থায় পৌঁছে গেলো।

এ সময় লোকজন নবীর নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করলো। কারণ, নবী কখনো এতো দীর্ঘ সময় নির্জনবাসে থাকেন না। ক্রমবর্ধমান কৌতূহল তাদেরকে হজরত সুলায়মান আ. এর খোঁজ নিতে উদ্যোগী করেছে। তারা তাদের আপনজন বাদশাহ্র কক্ষে ঢুকেই বুঝতে পারলো– তাঁর মৃত্যু অনেক আগেই হয়েছে। ঘুণপোকার আগ্রাসনে লাঠির যে দশা হয়েছে তা দেখেই একথা অনুমান করতে কারো বেগ পেতে হলো না।

হজরত সুলায়মান আ. এর ইন্তেকালের খবর লোকমুখে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। তাতে জ্বিনদের জানতে আর বাকী রইলো না যে, নবী অনেক আগেই দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। খবর জেনে তারা দুঃখে পরিতাপে একেবারে অস্থির হয়ে পড়লো।

নবীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জ্বিনরা শোকাভিভূত হয়েছে তা নয়। তারা শুধু তাদের কাজগুলোকে পণ্ডশ্রম মনে করে হাহাকার করতে লাগলো।

যারা জ্বিন জাতি ভূত ভবিষ্যৎ সবকিছু জানে বলে মন্তব্য করেন, তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের মর্মস্থলে হানা দিয়ে জ্বিন সম্প্রদায় আক্ষেপের সুরে বলে উঠলো, 'কী ভালোই না হতো। যদি আমরা গায়েবী বিদ্যা জানতাম। তাহলে এ কঠিন সমস্যায় পড়ে থাকতাম না।'

Avgv‡`i cKvwkZ eB

Zvdmx‡i gvhnvix (1Ñ12) †gvU 12 LÊ
gv`v‡iRb beIqvZ (1-8) †gvU 8 LÊ
gvKvgv‡Z gvhnvix
gKwkdv‡Z Avqwbqv • gvAvÕwi‡d jv`wbqv
gve`v Iqv gvÕAv`

gKZev‡Z gvmgxqv (1-3) †gvU 3 LÊ
bKkv‡q bKke›` • †Piv‡M wPkZx • evqvbj evKx
Rxjvb m‡hi nvZQwb • b‡i †miwn›` • Kwjqv‡ii KZe • c_g cwievi
gnv‡cwgK gmv • Zwg‡Zv †gv‡k` gnvb • bexbw›`bx

Avevi Avm‡eb wZwb
m›`i BwZeË • †dvjv‡Zi Zxi • gnv cve‡bi Kwnbx
Kx n‡qwQ‡jv Aeva¨‡`i

THE PATH
c_ cwiwPwZ • bvgv‡Ri wbqg • igRvb gvm • Bmjvgx wekvm
BASICS IN ISLAM • gvjveÏv wgbû

†mvbvi wkKj
wekv‡mi ewówPý • mxgvšcnix me m‡i hvI
ZwIZ wZw_i AwZw_ • †f‡O c‡o evZv‡mi wmwo
bx‡o Zvi bxj †XD • axi mi wejw¤Z e¨_v

ISBN 984-70240-0043-9

হাকিমাবাদ
খানকায়ে
মোজাদ্দেদিয়া